BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

জহির লাজুক মুখে বলল, স্যার, আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি যাব, একটা জরুরি কাজ।

বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে গেল, গলার স্বর অন্যরকম শোনাল। কথার মাঝখানে খুকখুক করে কয়েকবার কাশল, নাকের ডগা ঈষৎ লালচে হয়ে গেল। হেড-ক্যাশিয়ার করিম সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন, ব্যাপারটা কী ?

জহির মাথা নিচু করে অস্পষ্ট গলায় দ্বিতীয়বার বলল, একটা জরুরি কাজ।

করিম সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। জরুরি কাজে বাড়িতে যাবে এটা বলতে গিয়ে লজ্জায় ভেঙে পড়ার অর্থ তিনি ধরতে পারলেন না।

জহির অবশ্যি এমনিতেই লাজুক ধরনের ছেলে। লজ্জার সঙ্গে আরো একটা অস্বস্তিকর জিনিস তার মধ্যে আছে, যার নাম বিনয়। সেই বিনয়ও বাড়াবাড়ি বিনয়। হাইকোর্টের সামনে একবার জহিরের সঙ্গে দেখা, সে সাইকেলে করে কোথায় যেন যাচ্ছিল। করিম সাহেবকে দেখে আচমকা ব্রেক কষে নেমে পড়ল। বাকি পথটা সাইকেল টেনে পেছনে পেছনে আসতে লাগল। করিম সাহেব বললেন, তুমি পেছনে পেছনে আসছ কেন ? যেখানে যাচ্ছ যাও। জহির বলল, অসুবিধা নেই স্যার। করিম সাহেব বুঝতে পারলেন এটা হচ্ছে জহিরের বিনয়ের একটা নমুনা। তিনি হেঁটে যাবেন আর জহির সাইকেলে তাকে পাস করে যাবে তা সে হতে দেবে না। তিনি বাধ্য হয়ে একটা রিকশা নিলেন, এবং জহিরের উপর যথেষ্ট বিরক্ত হলেন। তিনি মিতব্যয়ী মানুষ। অকারণে টাকা খরচ করতে তার ভালো লাগে না।

ক্যাশ সেকশনে জহির তিন বছর ধরে আছে। এই তিন বছরে জহিরের বিখ্যাত বিনয়ের সঙ্গে তার অনেক পরিচয় হয়েছে। প্রতিবারই তিনি বিরক্ত হয়েছেন। শুরুতে তার মনে হয়েছিল জহিরের লজ্জা এবং বিনয় দুইই এক ধরনের ভড়ং, যা প্রথম কিছুদিন থাকে তারপর আসল মূর্তি বের হয়। ইউনিয়ন টিউনিয়ন করে গায়ে চর্বি জমে যায়, তখন মুখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া

ছেড়ে মেয়েমানুষ বিষয়ক রসিকতা করে হা-হা করে হাসে। জহিরের বেলায় এখনো তা হয় নি। কে জানে হয়তো তার চরিত্রই এরকম। অফিস ছুটির দশ মিনিট আগেও যদি তার হাতে একটা মোটা ফাইল ধরিয়ে বলা হয়— জহির, হিসেবটা একটু দেখে দাও তো। সে তৎক্ষণাৎ বলবে, জি আচ্ছা স্যার। বিনয়ী এবং ভদ্রমানুষেরা কাজকর্মে সুবিধার হয় না। তারা সাধারণত ফাঁকিবাজ হয়। জহির সে-রকম নয়। ক্যাশের কাজকর্ম সে শুধু যে বোঝে তাই না— ভালোই বোঝে। করিম সাহেব তার উপর অনেকখানি নির্ভর করেন।

আজ অফিসে কাজের চাপ আছে। ইয়ারএন্ডিং, হিসাবপত্র আপটুডেট করতে হবে। করিম সাহেব, অডিট ঝামেলা করতে পারে এমন সব ফাইলগুলি আলাদা করে রেখেছিলেন, ভেবেছিলেন, ছুটির পরও কাজ করবেন। ক্রশ চেকিং করবে জহির। অথচ বেছে বেছে আজই তার সকাল সকাল বাড়ি যেতে হবে। কোনো মানে হয়?

করিম সাহেব বললেন, তুমি কি এখনি চলে যেতে চাও?

জহির হাত কচলাতে লাগল। তার কানের ডগাও এখন ঈষৎ লাল। করিম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কী?

জহির প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, কিছু না স্যার।

বাড়িতে কোনো অসুখ-বিসুখ?

জি-না।

বলতে কি কোনো অসুবিধা আছে?

একটা বিয়ের ব্যাপার স্যার।

বিয়ে? কার বিয়ে?

জহির জবাব দিল না, ঘামতে লাগল। করিম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তোমার বিয়ে?

ঠিক বিয়ে না স্যার। মেয়ে দেখা।

তোমার জন্যে?

জহিরের মাথা আরো নিচু হয়ে গেল। করিম সাহেব হাসিমুখে বললেন, এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? এটা তো ভালো কথা। ইয়াং ম্যান, বিয়ে করে সংসারী হবে, এ তো আনন্দের কথা। আজকাল ছেলেপুলেরা বিয়েই করতে চায় না। দায়িত্ব এড়াতে চায়। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে অথচ বিয়ে করবে না।

জহির আগের ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে রইল। করিম সাহেব ফাইলপত্র গোছাতে শুরু করলেন। জহির না থাকলে তাঁর থাকাও অর্থহীন। আজ তিনিও একটু সকাল সকাল ফিরবেন। করিম সাহেব ড্রয়ার বন্ধ করতে করতে বললেন, মেয়ে কোথায় দেখতে যাবে?

যাত্রাবাড়িতে। মেয়ে ওর বড় চাচার সঙ্গে থাকে।

যাত্রাবাড়ি তো অনেক দূর। যাবে কিসে? তোমার সাইকেলে করে নাকি?

জহির রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। করিম সাহেব বললেন, অফিসের গাড়ি নিয়ে যাও না কেন? অফিসের কর্মচারীরা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে গাড়ি নিতে পারবে এরকম নিয়ম তো আছে।

গাড়ি লাগবে না স্যার।

লাগবে না কেন? পাওয়া গেলে তো অসুবিধা কিছু নেই।

আমাকে দিবে না স্যার। গাড়ি অফিসারদের জন্যে।

দাঁড়াও, আমি মোজাফফর সাহেবকে বলে দেখি। রিকশা করে মেয়ে দেখতে যাওয়া আর গাড়ি করে দেখতে যাওয়া তো এক না।

করিম সাহেব উঠে গেলেন। জহির খুবই অবাক হলো। সে ভাবতেও পারে নি করিম সাহেব সত্যি সত্যি তার জন্যে এতটা করবেন। তার ধারণা করিম সাহেব তাকে পছন্দ করেন না। গত বৎসর ইনক্রিমেন্ট লিস্টে তিনি তার নাম দেন নি। অফিসের মধ্যে একমাত্র তারই কোনো ইনক্রিমেন্ট হয় নি। সে বড় লজ্জা পেয়েছিল।

করিম সাহেব যে-রকম হাসি-খুশি মুখে ভেতরে গিয়েছিলেন সে-রকম ফিরলেন না, ফিরলেন মুখ কালো করে। শুকনো গলায় বললেন, একটা গাড়ি না-কি গ্যারেজে, আর অন্য গাড়িটার ড্রাইভার নেই। বলতে বলতে তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, ড্রাইভার নেই এটা নিতান্তই ফালতু কথা, দিবে না এটা হচ্ছে কথা। জিএম সাহেবকে বলব। উনি একটা মিটিং-এ আছেন।

আমার গাড়ি লাগবে না স্যার। আপনার কিছু বলার দরকার নেই।

তুমি থাক কোথায়?

কল্যাণপুর।

বাবা-মা সঙ্গে আছেন, না একাই থাক?

বাবা-মা বেঁচে নেই স্যার।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

করিম সাহেব খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। এই ছেলে তিন বছর ধরে তার সামনের টেবিলে মাথা গুঁজে কাজ করছে অথচ তিনি তার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, ব্যাপারটা অন্যায়ই হয়েছে। খুবই অন্যায়।

বাসা ভাড়া করে থাক?

জি স্যার।

ভাড়া কত?

নয়শ' টাকা।

বলো কী! নয়শ টাকায় বাড়ি হয়?

ছোট বাসা। দুইটা রুম। অনেক ভিতরের দিকে। গ্যাস নাই তাই...

করিম সাহেব খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, টাকা যা পাও তাতে চলে? চলার তো কথা না।

দুইটা টিউশনি করি।

অফিসের কাজের পরে টিউশনির ধৈর্য থাকে?

উপায় কী স্যার?

তা ঠিক। উপায় নেই, বাঁচাই মুশকিল। তবু যে মানুষ বেঁচে আছে এইটাই আশ্চর্য।

আমি স্যার যাই।

দাঁড়াও একটু। জিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিই।

কোনো দরকার ছিল না স্যার।

একটু অপেক্ষা করলে ক্ষতি তো কিছু নেই। তুমি তোমার টেবিলে গিয়ে বসো খানিকক্ষণ। কিংবা যাও ক্যান্টিনে বসে এক কাপ চা খাও।

জহির অস্বস্তি নিয়ে ক্যান্টিনে চলে গেল। অস্বস্তির কারণ হচ্ছে, করিম সাহেব খুবই রগচটা ধরনের মানুষ। হঠাৎ হঠাৎ অসম্ভব রেগে যান। আজ তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মোজাফফর সাহেবের সাথে একটা ছোটখাট চটাচটি হয়েছে। জিএম সাহেবের সঙ্গেও হয় কি-না কে জানে। হওয়া বিচিত্র না।

অফিস ক্যান্টিনে চা ভালো বানায়, কিন্তু আজকের চা-টা মুখে দেয়া যাচ্ছে না। কেমন একটা বিস্বাদ, তিতকুটে ভাব। জহির সিগারেট ধরাল। সে দরজার দিকে মুখ করে বসেছে, যাতে করিম সাহেবকে আসতে দেখলে চট করে ফেলে দিতে পারে। সিগারেটও ভালো লাগছে না, বরং মাথা ঘুরছে। মেয়ে দেখতে

যাবার উত্তেজনায় একরম লাগছে কি-না কে জানে। এই মেয়েটির আগে সে আরো দু'জনকে দেখেছে, তখন এরকম লাগে নি। আজকের বাড়াবাড়ি উত্তেজনার কারণ হচ্ছে জহিরের মামা বলেছেন— একটা আংটি সাথে করে নিয়ে নিও। পছন্দ হলে 'বিসমিল্লাহ' বলে আংটি পরিয়ে দিলেই হবে। এনগেজমেন্টের যন্ত্রণা মিটে গেল। তবে মেয়ে তোমার পছন্দ হবে। রূপবতী মেয়ে। একটু অবশ্যি রোগা, তাতে কী? আজকালকার মেয়ে সবাই রোগা।

আংটি জহির গতকাল কিনেছে। পাথর বসানো আংটি। এতটুকু একটা জিনিস, দাম নিল তিনশ' টাকা। রোগা মেয়েদের আঙুলও সরু সরু হয় কি-না কে জানে। অবশ্যি না লাগলে অসুবিধা হবে না, দোকানে বলা আছে ওরা বদলে দেবে। জহির পকেট থেকে আংটির বাক্সটি বের করে আবার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে ভরে ফেলল। করিম সাহেব হঠাৎ চলে এলে লজ্জায় পড়তে হবে। আচ্ছা আংটিটা আগ বাড়িয়ে কেনা ঠিক হয়েছে কি? যদি মেয়ে পছন্দ না হয়? পছন্দ না-ও তো হতে পারে।

অবশ্যি জহিরের মন বলছে, মেয়ে পছন্দ হবে। এর আগে যে দু'জনকে সে দেখেছে তাদেরকে সে পছন্দ করেছে। প্রথম যে মেয়েটাকে দেখল তার নাম আসমা। কী শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা। চায়ের ট্রে নিয়ে খালি পায়ে ঘরে ঢুকেছিল। ঘরে ঢুকবার সময় চৌকাঠে হোঁচট খেল। একটা চায়ের কাপ উল্টে গেল। মেয়ের এক চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন— কী যন্ত্রণা! চাচার কথা শুনে মেয়েটার মুখ লজ্জায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জহিরের মনটা মায়ায় ভরে গেল। সে মনে মনে বলল— আহা বেচারি!

এত পছন্দ হয়েছিল মেয়েটিকে অথচ বিয়ে হলো না। কথাবার্তা ঠিক ঠাক হবার পর হঠাৎ শুনল মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে সিলেটের চা-বাগানের এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার। ভালো একটা ছেলে পেয়ে মেয়ের বাবা-মা রাতারাতি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। মাসখানিক জহির খুব কষ্টে কাটিয়েছে। শুধু মেয়েটার কথা মনে পড়ত। তিনবার তাকে স্বপ্নেও দেখল। একটা স্বপ্ন খুব অদ্ভুত। যেন তাদের বিয়ে হয়েছে। জহির বিয়ের পরদিনই একটা চা-বাগানে ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কী আশ্চর্য, একা একা আসমা সেই বাগানে এসে উপস্থিত। জহিরকে দেখে কান্না কান্না গলায় বলল, তুমি পারলে আমাকে ফেলে চলে আসতে? তুমি এত পাষাণ? জহির হাসতে হাসতে বলল, কী মুশকিল, আমার কাজকর্ম আছে না? চা-বাগানের ম্যানেজারির যে কী যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো না। আসমা এই কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি যদি এই মুহূর্তে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে না আস তাহলে

আমি বিষ খাব। এই দেখ, আমার শাড়ির আঁচলে বিষ বাঁধা আছে। স্বপ্নে ব্যাপারগুলি খুব দ্রুত ঘটে। এই স্বপ্নেও তাই হলো। আসমা হঠাৎ শাড়ির আঁচল খুলে সবটা বিষ মুখে দিয়ে দিল।

জহির!

জহির চমকে উঠে দাঁড়াল। করিম সাহেব কখন ঘরে এসে ঢুকেছেন সে বুঝতেই পারে নি।

তুমি চলে যাও জহির। গাড়ি পাওয়া যায় নি। কিছু মনে করো না, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

জি-না স্যার। মনে করার কী আছে?

মনে করার অনেক কিছুই আছে। এখন এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। আচ্ছা তুমি যাও।

করিম সাহেবের মুখ থম থম করছে। জহিরের অস্বস্তির সীমা রইল না। স্যার নিশ্চয়ই জিএম সাহেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছেন। ব্যাপারটা ভালো হলো না। জহিরের মনে কঠিন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। জিএম সাহেব লোক সুবিধার না। করিম সাহেবের সঙ্গে যদি কথা কাটাকাটি হয় তাহলে ব্যাপারটা তিনি সহজে ভুলবেন না। এবং সুযোগ বুঝে শোধ তুলবেন।

আসলে আজকের দিনটিই জহিরের জন্যে খারাপভাবে শুরু হয়েছে। গত রাতে একটা পাউরুটি এনে রেখেছিল, সকালে উঠে চায়ের সঙ্গে খেয়ে নেবে। সকালবেলা দেখা গেল পাউরুটি বাসি। মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিতে হলো। মুখে দেয়া যায় না এমন টক।

বাসে আসবার সময় পাঁচটা টাকা শুধু শুধু চলে গেল। ভাংতি ছিল না বলে কন্ডাকটারকে পাঁচ টাকা দিয়েছে। কন্ডাকটার বলল, নামনের সময় লইবেন। ব্যাপারটা সারাক্ষণই মনে ছিল, অথচ সে নেমে গেল টাকা না নিয়েই। আজকের দিনে আরো কত অঘটন তার জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে। হয়তো মেয়ে দেখে পছন্দ করে আংটি দেবার সময় মেয়ে বলবে, না, না, আমি আংটি পরব না। বিচিত্র কিছু না, এমন হতে পারে।

দ্বিতীয় মেয়েটির বেলায় ঠিক এই জিনিস হলো। এই মেয়েটিকে সে দেখেছিল বাসাবোতে, তার ফুপার বাসায়। মেয়েকে দেখার আগেই সে তার ছবি দেখেছিল। ছবিতে সে ডোরাকাটা একটা শাড়ি পরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। হাসি হাসি মুখ, তবে চোখ দুটো বিষণ্ন। বিয়ের পর এই মেয়ে তার পাশে পাশে থাকবে, তার বাসার রেলিং ধরে ঠিক এই ভঙ্গিতে দাঁড়াবে—

ভাবতেই কেমন যেন লাগে। জহিরের বাসায় রেলিং নেই, সে ছবি দেখার পর ঠিক করে ফেলেছিল বিয়ের পর রেলিং আছে এমন একটা বাড়িতে সে উঠে যাবে। ভাড়া যদি বেশি দিতে হয় দেবে। সব সময় টাকা-পয়সার কথা ভাবলে তো হয় না।

মেয়েটিকে চাক্ষুষ দেখে তার অবশ্যি একটু মন খারাপ হয়েছিল। সে ছবির মতো সুন্দর না। তবু তাকে ভালো লাগল। জহিরের মনে হলো এই মেয়ের মধ্যে মায়া-ভাবটা খুব প্রবল। তার হাঁটা, কথা বলা সব কিছুর মধ্যে কোমল একটা ব্যাপার আছে। তাকে দেখে মনে হয় এই মেয়ে কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে পারে না। তার সেই ক্ষমতাই নেই। অথচ এই মেয়েটিই কি-না তাকে অপছন্দ করল। মেয়ের ফুপা জহিরের মামাকে বললেন, সব তো ঠিকঠাকই ছিল, তবে মেয়ে রাজি হচ্ছে না। খুব কান্নাকাটি করছে। মেয়ের মতের বিরুদ্ধে জোর করে কিছু করা ঠিক হবে না।

তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে এই সম্ভাবনাতে একটা মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছে— এটা ভাবতেও মন ভেঙে যায়। কয়েক রাত জহির ঘুমুতে পারল না। সে কি এতই নগণ্য? এতই তুচ্ছ? সে একটা ছোট চাকরি করে। তাতে কী? সবাই কি বড় চাকরি করবে? আর চেহারা? তার চেহারা খুব কি খারাপ? তার চেয়ে খারাপ চেহারার ছেলেদেরকে কি মেয়েরা পছন্দ করে বিয়ে করে না?

এই মেয়েটার ছবি জহিরের ড্রয়ারে এখনো আছে। তার শোবার ঘরের দু'নম্বর ড্রয়ারে। এই ড্রয়ারে তার দরকারি কাগজপত্র থাকে। এইসব কাগজপত্র ঘাঁটতে গেলে প্রায়ই ছবিটা তার চোখে পড়ে, তখন বুকের মধ্যে হু হু করতে থাকে। ছবিটার উল্টো পিঠে ইংরেজিতে লেখা— নুরুন নাহার। কে জানে হয়তো মেয়েটা নিজেই লিখেছে। সুন্দর হাতের লেখা। বিয়ে হলে সে তাকে 'নাহার' বলে ডাকত।

এই নাহার, এক কাপ চা দিয়ে যাও তো।

এই নাহার, জানালাটা একটু বন্ধ করো না, রোদ আসছে।

নাহারের বিয়ে হয়েছে কি-না কে জানে। বিয়ে হয়ে থাকলে তার স্বামী তাকে কি নাহার নামেই ডাকে? এই একটা তুচ্ছ জিনিস কেন জানি জহিরের খুব জানতে ইচ্ছা করে। তার মনে আরেকটা গোপন ইচ্ছাও আছে। একদিন সে নাহারদের বাড়িতে উপস্থিত হবে। নাহার চমকে উঠে বলবে, আপনি কী চান? জহির বলবে, কিছু চাই না। ছবিটা ফেরত দিতে এসেছি। নাহার বিস্মিত হয়ে বলবে, কিসের ছবি?

আপনি রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ছবিটা। আপনার ফুপা আমাকে দিয়েছিলেন।

এই জন্যে কষ্ট করে এসেছেন ? ছি-ছি। আপনার কাছে থাকলেই হতো। ফেরত দেয়ার কোনো দরকার ছিল না। আচ্ছা, এনেছেন যখন দিন।

যাই তাহলে।

যাবেন কেন, বসুন। চা খান। আর আপনাকে আরেকটা কথা বলা হয় নি।

কী কথা ?

আপনাকে বোধহয় বড় ফুপা বলেছেন যে আমি আপনাকে অপছন্দ করেছি। আসলে তা ঠিক না। আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করেছিলাম, ওরাই রাজি হলেন না। মিথ্যা করে আমার নামে দোষ দিয়েছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছু মনে করি নি।

এইসব কথা ভাবতে জহিরের খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে চোখে পানি পর্যন্ত এসে যায়। মনে হয়, সে যা ভাবছে তাই সত্যি, আশপাশের পৃথিবীটা সত্যি নয়।

দুপুর তিনটার দিকে জহির ঝিকাতলায় তার মামার বাসার সামনে উপস্থিত হলো। জহিরের সঙ্গে তার মামা বদরুল সাহেবও যাবেন। তাদের যাবার কথা পাঁচটার দিকে। দু'ঘণ্টা আগে চলে আসায় জহিরের কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে। তারা কী ভাববে, কে জানে। আরো কিছুক্ষণ পরে এলে কেমন হয় ? কোনো একটা চায়ের দোকানে ঘণ্টাখানিক কাটিয়ে আসা যায় না ? সেটাই ভালো। জহির বসবার ঘরের বারান্দা থেকে চুপি চুপি নেমে গেল।

বসবার ঘরের জানালার পাশে তরু দাঁড়িয়েছিল। তরু বদরুল সাহেবের মেজো মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে এইবার ফার্স্টইয়ারে ভর্তি হয়েছে। বোটানিতে অনার্স। আজ তাদের একজন স্যার মারা যাওয়ায় ইউনিভার্সিটি একটার সময় ছুটি হয়ে গেছে। সে ভেবেছিল আরাম করে দুপুরে ঘুমুবে। অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘুম না আসায় সে বসার ঘরে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। ভাগ্যিস দাঁড়িয়েছিল। না দাঁড়ালে এই অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পেত না। জহির ভাই কেমন ঘামতে ঘামতে এলেন। দরজার কড়া নাড়তে গিয়েও না নেড়ে কেমন চুপি চুপি নেমে গেলেন। যেন বিরাট একটা অপরাধ করেছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, জহির ভাইকে দেখা গেল রাস্তার ওপাশে বিসমিল্লাহ হোটেল এন্ড

রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকছেন। তরু ভেবেছিল ঢুকেই বোধহয় বের হয়ে আসবেন। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। জহির ভাই বেরুলেন না। তরুর খুব ইচ্ছা করছে ঐ রেস্টুরেন্টে উঁকি দিয়ে দেখে ব্যাপারটা কী ? ইচ্ছা করলেও যাওয়া যাবে না। ঐ রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে বখা ছেলেদের আড্ডা। ঐ সব বখাদের একজনের গানের গলা আবার খুব ভালো। স্কুল কলেজের মেয়েরা সামনে দিয়ে গেলেই সেই বখা গায়ক গান ধরে— 'ও চেংড়ি চেংড়ি রে, ফিরে ফিরে তাকায় রে। বড় সুন্দর দেখায় রে।' দল বেঁধে মেয়েরা যখন যায় তখন এই গান উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু একা একা যাবার সময় গান শুনলে দুঃখে কষ্টে চোখে পানি এসে যায়। বখাগুলি দুপুরবেলা দুটা টেবিল একত্র করে তাস খেলে। জহির ভাই ঐ বখাগুলির সঙ্গে কী করছে ? তরুর মন অস্বস্তিতে ভরে গেল।

ভাদ্রমাসের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরগুলি এমনিতেই ছমছমে লাগে। আজ যেন আরো বেশি লাগছে।

তরু বসার ঘর থেকে ভেতরের বারান্দায় এলো, সেখান থেকে শোবার ঘরে ঢুকল। তরুর মা মেঝেতে একটা বালিশ পেতে ঘুমোচ্ছেন। তার মাথার উপর সাঁ সাঁ করে ফ্যান ঘুরছে। ফ্যানের বাতাসে তাঁর মাথার চুল উড়ছে। এই দৃশ্যটা তরু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। সেখান থেকে গেল পাশের ঘরে। এই ঘরটা তরু এবং মীরুর। মীরু, তরুর ছোটবোন, এবার ক্লাস নাইনে উঠেছে। সে এখনো স্কুল থেকে ফেরে নি বলেই ঘর চমৎকার গোছানো। সে ফিরে এলে মুহূর্তের মধ্যে ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তার জন্যে মীরুকে কিছু বলা যাবে না। শেষ বয়সের মেয়ে বলে মীরুর মা, শাহানা, মেয়েকে কখনো কিছু বলেন না। কেউ একটা কড়া কথা বললে তিনি ব্যথিত গলায় বলেন, এইসব কী। ও ছোট না?

আদরে আদরে মীরুর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে বলে তরুর ধারণা। মীরু অসম্ভব জেদি এবং রাগী হয়েছে। একবার রাগ করে দুদিন ভাত না খেয়ে ছিল। তারচেয়েও সমস্যার কথা ইদানীং তার বোধহয় কোনো একটা ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে। সেই ছেলের লেখা একটা কাঁচা প্রেমপত্র তরু উদ্ধার করেছিল। মাকে তা দেখাতেই তিনি বললেন, ওর দোষ কী বল? জোর করে দিয়ে দেয়। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের হাড্ডি। তরু অবাক হয়ে বলল, তুমি মীরুকে কিছু বলবে না?

বলব। ধীরে সুস্থে বলব। এত তাড়াহুড়ার কী? কিছু বলব, তারপর দেখবি রাগ করে ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেবে। আরেক যন্ত্রণা।

শাহানা কিছুই বলেন নি। মীরুর কোনো অপরাধ তাঁর চোখে পড়ে না। কোনোদিন হয়তো পড়বেও না। এবং একদিন দেখা যাবে মীরু একটা কাণ্ড করে বসেছে।

তরু নিজের ঘর থেকে বের হয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিল। এই ঘরটা আপাতত ফাঁকা। দেশের বাড়ি থেকে কেউ এলে থাকে। এখন মতির মা শুয়ে আছে। এই ঘরেও ফ্যান আছে। ফ্যান ঘুরছে ফুল স্পিডে, তবু মতির মা'র হাতে একটা পাখা। ঘুমের মধ্যেই সে তালের পাখা নাড়ছে। তরু ডাকল, এই মতির মা। মতির মা।

মতির মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, কী আফা?

একটু দেখে আস তো চায়ের দোকানটায় জহির ভাই বসে আছেন কি-না।

আইচ্ছা আফা।

বলেই মতির মা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। মতির মাকে হাজার ডাকাডাকি করেও লাভ হবে না। সে ঠিকই সাড়া দেবে, তারপর 'আইচ্ছা' বলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

তরু বসার ঘরে এলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জহির ভাই কি চলে গেল না-কি? হঠাৎ তরুর চোখে পানি এসে গেল। ব্যাপারটা এত হঠাৎ হলো যে সে লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়ল। জহির ভাইকে সে খুব পছন্দ করে তা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই না যে তার কথা ভাবতে গিয়ে চোখে পানি আসতে হবে। ছি কী লজ্জার ব্যাপার! ভাগ্যিস কেউ দেখে ফেলে নি।

জহিরকে সে প্রথম দেখে পাঁচ বছর আগে। সে তখন ক্লাস এইটে পড়ে। কী কারণে যেন দুই পিরিয়ড পরেই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। সে বাসায় এসে গল্পের বই নিয়ে বসেছে, তার কিছুক্ষণ পরেই জহির এসে উপস্থিত। হাতে একটা চামড়ার স্যুটকেস, সঙ্গে সতরঞ্জির একটা বিছানা। তার গায়ে হলুদ রঙের শার্ট। গলায় কটকটে লাল রঙের মাফলার। তরু বলল, কাকে চান?

লোকটি একটু টেনে টেনে বলল, এটা বরকত সাহেবের বাসা?

জি।

উনাকে একটু ডেকে দেবেন? আমি শ্যামগঞ্জ থেকে আসছি।

আব্বা তো অফিসে।

অফিসে? কখন আসবেন?

পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময়।

আচ্ছা তাহলে যাই। স্লামালিকুম।

লোকটা তার মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে স্লামালিকুম দিচ্ছে, কী আশ্চর্য! তরুর খুব মজা লাগল। সে বলল, আম্মা আছে, আম্মাকে ডেকে দেব?

না। উনি আমাকে চিনবেন না। আমি আসব সাড়ে পাঁচটার সময়। স্যুটকেসটা রেখে যাই ?

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় আবার এসে উপস্থিত। তরু বলল, বাবা এখনো আসেন নি। মাঝে মাঝে উনি তাস খেলতে যান, তখন ফিরতে দেরি হয়।

কত দেরি হয় ?

তার কোনো ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন রাত আটটা-নটাও বাজে।

আচ্ছা আমি তাহলে নটার সময় আসব।

বসুন না। এখানে বসে অপেক্ষা করুন। মা-কে ডাকি ?

উনি আমাকে চিনবেন না।

তরু হাসিমুখে বলল, আপনি আমাদের আত্মীয় হন ?

হুঁ। সম্পর্কে তোমার ভাই হই।

তাই নাকি ?

মামা, অর্থাৎ তোমার আব্বা চিনবেন। তোমাদের আদিবাড়ি শ্যামগঞ্জের রসুলপুর। মিয়া বাড়ি। এক সময় খুব নামকরা বাড়ি ছিল। এখন অবশ্য গরিব অবস্থা।

গরিব অবস্থা যে তা অবশ্য তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। শীতের কাপড় বলতে গলার লাল রঙের মাফলার। জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড শীত মানুষটা একটা মাফলার দিয়ে সামাল দিচ্ছে কীভাবে কে জানে। তরুর খুব ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে, আপনার শীত লাগছে না ? লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারছিল না। তরু বলল, বসুন না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

জহির বসল, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বরকত সাহেব এসে পড়লেন। তাঁর বয়স তিপ্পান্ন, দেখাচ্ছে তার চেয়েও বেশি। তিনি ইস্টার্ন প্যাকেজিং লিমিটেডের এজিএম। এই কোম্পানির অবস্থা বেশ ভালো। তবে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে মালিকানা হাতবদল হবে। নতুন মালিক কিছু লোকজন সবসময় ছাঁটাই করেন। বরকত সাহেবের ধারণা তিনি এই ছাটাইয়ে পড়বেন। এইসব কারণে কদিন ধরেই তাঁর মন ভালো নেই।

রোজ মুখ অন্ধকার করে বাড়ি ফেরেন। জহিরকে দেখে অপ্রসন্ন গলায় বললেন, তুমি ? তুমি কোত্থেকে ?

জহির কদমবুসি করতে করতে বলল, এই বৎসর বিএ পাস করেছি মামা। চাকরির সন্ধানে এসেছি।

এই কথায় বরকত সাহেবের মুখ আরো অন্ধকার হয়ে গেল।

চাকরির কোনো খোঁজ পেয়ে এসেছ, না এখন খুঁজবে ?

জি এখন খুঁজব। মফস্বলে থেকে কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

বরকত সাহেবের মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, বসো, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

বিএ-তে সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি, মামা।

ভালো। খুব ভালো। চাকরির বাজারে অবশ্যি বিএ-এমএ কোনো কাজে লাগে না, সব ধরাধরি। এসে ভুল করেছ।

বরকত সাহেব বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহানার সঙ্গে ছোটখাট একটা ঝগড়া বেঁধে গেল। শাহানা চাচ্ছেন যেন এই ছেলেকে এক্ষুণি বলা হয়— এই বাড়িতে থেকে চাকরি খোঁজা সম্ভব না। প্রথমত, থাকার জায়গা নেই। দ্বিতীয়ত, এই বাজারে একটা বাড়তি লোক পোষার প্রশ্নই ওঠে না।

বরকত সাহেব এইসব কথা এক্ষুণি বলতে চাচ্ছেন না। তিনি বললেন, রাতটা থাকুক, সকালে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেই হবে।

শাহানা বললেন, গ্রামের এইসব মূর্খ ছেলে, এদের সরাসরি না বললে কিছুই বুঝবে না। ভাত খাওয়াতে চাচ্ছ খাওয়াও, তারপর বিশটা টাকা হাতে ধরিয়ে বিদেয় করে দাও।

এতরাতে যাবে কোথায় ?

রাত এমন কিছু বেশি হয় নি। কতবড় গাধা, বিএ পাস করে ভাবছে লোকজন চাকরি নিয়ে তার জন্যে বসে আছে। এদের উচিত শিক্ষা হওয়া উচিত। লতায়-পাতায় সম্পর্ক ধরে উঠে পড়েছে। এদের কি কাণ্ডজ্ঞানও নেই ?

রাতটা থাকুক। সকালে বুঝিয়ে বলব। বিপদে পড়েই তো আসে। আত্মীয়তার দাবি নিয়ে এসেছে।

শাহানা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তার বিরক্তির কারণও ছিল। গত মাসেই একজন এসে দশদিন থেকে গেছে। ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত ছিল না। পঞ্চাশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে হয়েছে। তার আগের মাসে দু'জন এসেছিল চিকিৎসার জন্যে। তারা থেকেছে এগারো দিন। তাদের অসুখ সারে নি। চিঠি দিয়েছে আবার আসবে।

বরকত সাহেব হাত-মুখ ধুয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন। আবেগহীন গলায় বললেন, কাপড়চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া কর। সকালে কথা হবে।

জহির বলল, মামা, আমি তো এখানে কিছু খাব না।

খাবে না কেন?

আমাদের শ্যামগঞ্জের একটা ছেলে থাকে নাজিমুদ্দীন রোডের একটা মেসে। তাকে বলে এসেছি তার সঙ্গে খাব। ও অপেক্ষা করবে।

ও আচ্ছা।

আমি তাহলে মামা এখন উঠি।

উঠবে মানে। তুমি কি ঐ মেসেই উঠবে না-কি?

জি। আগে চিঠি দিয়ে রেখেছিলাম।

মেসে উঠতে চাও উঠবে। স্বাধীনভাবে থাকার একটা সুবিধা আছে। বাসা বাড়িতে সেই সুবিধা নেই। বাড়তি একটা লোক রাখার মতো অবস্থাও আমার নেই। তা না হলে...।

বরকত সাহেব কথা শেষ করলেন না। কী বলবেন গুছিয়ে উঠতে পারলেন না। এখন খানিকটা লজ্জিতও বোধ করছেন।

জহির বলল, মামিকে একটু সালাম করে যাই। উনার সঙ্গে দেখা হয় নাই কখনো।

শাহানার মুখের অপ্রসন্ন ভাব এখন আর নেই। তিনি বেশ আন্তরিক সুরেই বললেন, এত রাতে না খেয়ে যাবে সেটা কেমন কথা। যা আছে খেয়ে যাও।

আরেকদিন এসে খাব। আমি আমার এই স্যুটকেসটা রেখে যাই, কিছু দরকারি কাগজপত্র আছে। মেসে রাখা ঠিক না। বাচ্চাগুলির জন্যে সামান্য মিষ্টি এনেছিলাম। পাসের মিষ্টি, বিএ পাস করেছি। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি মামি।

বাহ্ ভালো তো। মিষ্টি আনার কোনো দরকার ছিল না।

কী যে বলেন, মামি। আত্মীয় বলে তো আপনারাই আছেন। আর তো কেউ নাই। বড় ভালো লাগল।

বরকত সাহেব বললেন, এই শীতে একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আছ। ঠাণ্ডা লাগছে না?

জহির লজ্জিত গলায় বলল, শার্টের নিচে স্যুয়েটার আছে মামা। একটু ছেঁড়া, এই জন্যে ভিতরে পরেছি। তাছাড়া মামা ঢাকা শহরে শীত একেবারেই নাই।

রাতে খাবার টেবিলে বরকত সাহেব গম্ভীর হয়ে রইলেন। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে নিচু গলায় বললেন, বেচারা দেখা করতে এসেছিল, আর কত কথাই না তুমি বললে। ছি-ছি।

শাহানা কঠিন গলায় বললেন, কঠিন কথা আমি কী বললাম? যা সত্যি তাই বলেছি। একেকজন আসে আর সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসে, তোমার মনে থাকে না?

সবাই তো একরকম না?

সবাই একরকম। তোমার জহিরও আলাদা কিছু না। দু'দিন পরে টাকা পয়সা ফুরিয়ে যাবে, এসে তোমার উপর ভর করবে।

নাও তো করতে পারে।

স্যুটকেস রেখে গেছে কী জন্যে তাও বোঝ না? রেখে গেছে যাতে সহজে আবার ঢুকতে পারে। স্যুটকেস রেখে যাবার তার দরকারটা কী? কোন কোহিনূর হীরা তার স্যুটকেসে আছে যে স্যুটকেস রেখে যেতে হবে!

তুমি সব কিছু বড় বেশি বোঝ।

বেশি বোঝাটা কি অন্যায়?

হ্যাঁ অন্যায়। যতটুকু বোঝার ততটুকুই বুঝতে হয়। তার বেশি না।

শাহানা কঠিন চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন। তরুর বড় বোন অরু তখন ক্লান্ত গলায় বলল, তোমরা কী শুরু করলে? রোজ ঝগড়া, বড় খারাপ লাগে।

শাহানা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, খারাপ লাগলে এই বাড়িতে পড়ে আছিস কেন? চলে যা।

অরু বলল, তাই যাব মা। সত্যি সত্যি যাব।

অরু তখন কলেজে পড়ে। লালমাটিয়া কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। সব সময় বিষণ্ন হয়ে থাকে। এই বিষণ্নতার কোনো কারণ কেউ জানে না। অরুর স্বভাব অসম্ভব চাপা। তার চরিত্রের মধ্যেও কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। গেট পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ফিরে এলো। শান্ত গলায় বলল, আজ কলেজে যেতে ইচ্ছে করছে না মা। শাহানা চিন্তিত হয়ে বললেন, শরীর খারাপ না-কি?

না, শরীর ঠিক আছে।

অরু নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এই দরজা সারাদিনেও খোলা হলো না। অরুর তখন নিজের একটা ঘর হয়েছে। স্টোররুমটাকেই সে ঘর বানিয়ে নিয়েছে। পায়রার খুপড়ির মতো একটা ঘর। ছোট্ট একটা জানালা। না

আছে আলো, না আছে বাতাস। তবু সে এই ঘরেই আছে। এইটাই তার ভালো লাগে।

শাহানা পৃথিবীর কাউকেই পরোয়া করেন না, কিন্তু কোনো বিচিত্র কারণে বড় মেয়েকে সমীহ করেন, অনেকখানিই করেন। অরুর স্বভাবই হচ্ছে মা যে ব্যাপারটা পছন্দ করেন না, সে তাই করবে। শাহানা একদিন বললেন, রোজ শাড়ি পরে কলেজে যাস কেন? এখন তো শাড়ি পরার বয়স হয় নি। যখন হয় তখন পরবি।

এখন পরলে অসুবিধা কী?

বড় বড় দেখায়।

বড় বড় দেখালে অসুবিধা কী?

তুই বড় যন্ত্রণা করিস অরু।

তুমিও বড় যন্ত্রণা কর মা।

অরু সেদিন থেকেই পুরোপুরি শাড়ি পরা শুরু করল। নতুন একটা কামিজ বানানো হয়েছে। একদিন মাত্র পরা হয়েছে। ঐটিও সে ছুঁয়ে দেখবে না।

শাহানা জহিরকে এ বাড়িতে রাখবে না, শুধুমাত্র এই কারণে অরু উঠে পড়ে লাগল যেন জহির এ বাড়িতে থাকে। শাহানা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, ওর থাকার জায়গা আছে। বন্ধুর সঙ্গে উঠেছে, ওকে জোর করে এখানে আনতে হবে?

বন্ধুর সঙ্গে আছে বাধ্য হয়ে, আমরা ওর আত্মীয়। আমরা ওর সুবিধা অসুবিধা দেখব না?

এরকম লতায়-পাতায় আত্মীয় দেখলে তো চলে না।

কেন চলবে না?

মেয়ে বড় হয়েছে, একটা পুরুষমানুষ হুট হুট করে ঘুরবে, তা কি সম্ভব?

পুরুষমানুষ কি বাঘ নাকি যে বড় মেয়ে দেখলেই চিবিয়ে গিলে ফেলবে?

তুই কেন শুধু শুধু ঝগড়া করিস? তোর সমস্যাটা কী?

আমার কোনো সমস্যা নেই, এর পরে যখন ছেলেটা আসবে তখন তাকে বলবে এ বাড়িতে থাকতে।

আচ্ছা বলব।

জহির থাকতে রাজি হলো না। এই ব্যাপারটা শাহানাকে বিস্মিত করল। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বলা মাত্র সে বিছানা বালিশ নিয়ে চলে আসবে। শাহানা

যখন আসতে বললেন, তখন সে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, খুব বিপদে পড়লে তো আসতেই হবে। না এসে যাব কোথায়! আত্মীয় বলতে তো এক আপনারাই আছেন।

শাহানা বললেন, বলা রইল, অসুবিধা মনে করলে আসবে।

জি আচ্ছা।

ছুটির দিন চলে আসবে। খাওয়া-দাওয়া করবে।

জি আচ্ছা।

চাকরি-বাকরির কোনো সুবিধা হলো?

খোঁজ করছি। তবে দুটা টিউশনি জোগাড় করেছি।

বলো কী, এর মধ্যে টিউশনিও জোগাড় করে ফেলেছ?

আমার বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছে।

একদিন তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসো।

জি আচ্ছা।

আরেকটা কথা বলে রাখি, ঐ দিকের ছোট ঘরটায় আমার বড় মেয়ে থাকে। ওর মেজাজ টেজাজ খুব খারাপ, তুমি যেন আবার হুট করে ওর ঘরে ঢুকবে না।

জি-না। ঢুকব না। মেজাজ খারাপ কেন?

জানি না। মেজাজের যন্ত্রণায় আমরা অস্থির।

আরেকটা কথা, ঐদিন শুনলাম মীরুর সঙ্গে তুমি তুই তুই করে কথা বলছ। গ্রামের ছেলেরা বাচ্চাদের সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে, তা আমি জানি। তুমি এটা করবে না।

জি আচ্ছা।

জহির প্রতি শুক্রবারে আসতে শুরু করল। খুব সকালে আসে, সারাদিন থেকে সন্ধ্যাবেলা চলে যায়। ছুটির দিনে বাইরের একটা মানুষ যে এসে সারাদিন থাকে এটা বোঝাই যায় না। পুরোপুরি নিঃশব্দ একটা মানুষ। বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে কিংবা বারান্দায় মোড়াতে মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে উঠানের ঘাসের দিকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে, জিজ্ঞেস না করলে মুখ তালাবন্ধ। একদিন দেখা গেল একটা খুরপি কিনে এনেছে। উঠানের ঘাস তুলে কী যেন করা হচ্ছে। শাহানা বলল, করছ কী তুমি?

কিছু না মামি।

মাটি কুপাচ্ছ কেন ?

কয়েকটা গাছ লাগিয়ে দিচ্ছি। গাছপালা নেই, জায়গাটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে।

পরের বাড়িতে গাছপালা লাগিয়ে লাভ নেই। তুমি এসব রাখ তো।

জি আচ্ছা।

রেশন এনে দাও। পারবে তো আনতে ?

জি পারব।

ছুটির দিনে ছোটখাট কাজের ভারগুলি আস্তে আস্তে তুলে রাখা হতে থাকে জহিরের জন্যে। এইসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় এক চিলতে উঠানের বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট গাছ, গাছগুলিও জহিরের মতোই প্রায় অদৃশ্য। এরা যে আছে তাই বোঝা যায় না। তারপর একদিন বোগেনভিলিয়ার লতানো গাছ ছাদে উঠে গাঢ় কমলা রঙের পাতা ছেড়ে দিল। দক্ষিণের উঠোনের কোনার দিকের গোলাপ গাছগুলি অবশ্যি আরো আগেই গোলাপ ফোটাতে শুরু করেছে।

দু'বছরের মাথায় জহিরের একটা চাকরিও হয়ে গেল। বড় এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে একদিন এসে মামা মামিকে সালাম করল। বরকত সাহেব বললেন, চাকরি জোগাড় করে ফেলেছ ? ভালো। খুব ভালো। তুমি দেখি অসাধ্য সাধন করলে।

তেমন কিছু না। প্রাইভেট ফার্ম।

প্রাইভেট ফার্মই ভালো। সরকারি চাকরি আর ক'জন পায় বলো ? খুশি হয়েছি। আমি খুব খুশি হয়েছি। এইবার বাসা ভাড়া করে টাকা-পয়সা জমাও। বিয়ে টিয়ে কর। সারাজীবন কষ্ট করেছ। এখন সুখ পাও কিনা দেখ।

জহিরের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরা গলায় বলল, আপনার এখানে যে আদর পেয়েছি, এই কথা আমি সারাজীবন ভুলব না মামা।

বরকত সাহেব খুবই অবাক হয়ে গেলেন, কী ধরনের আদর এই ছেলেকে করা হয়েছে তা বুঝতে পারলেন না। খানিকটা লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন।

চাকরি পাওয়ার পর জহিরের এ বাড়িতে আসা যাওয়ার পরিমাণ কিছু বাড়ল। ছুটির দিন ছাড়াও তাকে দেখা যেতে লাগল। হাতে নানান টুকিটাকি, যেমন একটা বেতের মোড়া, কারণ আগেরটা নষ্ট হয়ে গেছে। একটা হাতুড়ি, কারণ এ বাড়িতে হাতুড়ি নেই। এক বান্ডিল দড়ি। একবার এক চুনকামওয়ালা

মিস্ত্রি ধরে আনল বাড়ি চুনকাম করে দেবে। শাহানা বিরক্ত হয়ে বললেন, পরের বাড়ি আমি নিজের পয়সায় চুনকাম করব কেন ?

জহির লাজুক গলায় বলল, টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করবেন না মামি।

চিন্তা করব না মানে ? টাকা-পয়সা কে দেবে, তুমি ?

জহির মাথা নিচু করে রইল। শাহানা তীব্র গলায় বললেন, তুমি টাকা-পয়সা দেবে কেন ? কী অদ্ভুত কথা!

তাহলে মামি থাক। ওকে চলে যেতে বলি ?

হ্যাঁ বলো।

শুধু অরুর ঘরটা চুনকাম করে দিক।

শাহানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। জহির মৃদু স্বরে বলল, অরু ঐদিন বলছিল তার ঘরের দেয়ালগুলি বড় নোংরা— তার নাকি ঘেন্না লাগে।

এই শুনেই তুমি চুনকামওয়ালা নিয়ে এসেছ ? বলো, ওকে চলে যেতে বলো। এক্ষুণি যেতে বলো।

জি আচ্ছা।

শাহানার মনে অন্য একটা সন্দেহ দেখা দিল— জহির যে এত ঘন ঘন এখানে আসে তার মূল কারণ অরু নয় তো ? কী সর্বনাশের কথা! বরকত সাহেবের সঙ্গে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলেন। বরকত সাহেব হেসে উড়িয়ে দিলেন।

কী যে তুমি বলো! কোনো দিন কথাই বলতে দেখলাম না।

এইখানে হয়তো বলে না, কিন্তু বাইরে...

বাইরে কথা বলাবলির সুযোগ কোথায় ? বাজে ব্যাপার নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না।

শাহানা খুব ভরসা পান না। বাইরে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা পুরোপুরি বাদও দেয়া যায় না। অরু বরিশাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাকে বরিশালে আনা নেয়ার দায়িত্ব পালন করে জহির। তখন কি তাদের কোনো কথাবার্তা হয় না ? গ্রামের এইসব মিনমিনে ধরনের ছেলে ভিতরে খুব সজাগ। কী চাল চালছে কে জানে! তা ছাড়া তিনি লক্ষ করেছেন, জহির শুধু যে মীরুর সঙ্গে তুই তুই করে বলে তাই না, তরুর সঙ্গেও বলে। এইসব আলাপে গভীর অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া থাকে। এত কিসের খাতির ?

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে একবার কায়দা করে বললেন, জহির, অরুকে বিয়ে দেবার কথা ভাবছি। একজন ছেলেও মোটামুটি পছন্দ হয়েছে— ডাক্তার ছেলে।

জহির ভাত খাচ্ছিল। মুখ না তুলেই বলল, তাহলে তো ভালোই হয় মামি।

শিগগিরই বিয়েটা দিয়ে দেন, তোমার অনেক খাটাখাটনি আছে।

জহির কিছু বলল না। যেভাবে খাচ্ছিল সেইভাবেই খেয়ে চলল। শাহানার এই লক্ষণ ভালো লাগল না। তাছাড়া তার কাছে মনে হলো কথা শুনে জহির একটু মনমরা হয়ে গেছে। খাওয়া শেষ করে সে সেদিন আর অপেক্ষা করল না। অন্যদিন বেশ কিছুক্ষণ থাকে। শাহানার বুক কাঁপতে লাগল। সেই রাতে তার ঘুম ভালো হলো না।

তার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। এই ঘটনার পনের দিনের মাথায় অরু কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলল। তাদের লালমাটিয়া কলেজের ইতিহাসের একজন টিচারকে। বিয়ে হলো বরিশালে। অরু মেডিকেল কলেজ হোস্টেল থেকে চিঠি লিখে সব জানাল।

ইতিহাসের ঐ শিক্ষকের নাম আজাহার হোসেন। ভদ্রলোক বিবাহিত, বয়স চল্লিশের উপর। তার বড় ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর সুন্দর স্নিগ্ধ চেহারা। এই সুন্দর স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটি অরুদের বাসায় এসে কঠিন গলায় এমন সব কথা বলতে লাগলেন যে শাহানার ইচ্ছা করল নিজের গায়ে কেরেসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ছি-ছি, কী লজ্জা, কী লজ্জা!

অরু এখন ঢাকাতেই আছে। তার ডাক্তারি পড়া বন্ধ। সে একটা কিন্ডারগার্টেনে মাস্টারি করে এবং আজাহার হোসেনের সঙ্গে জীবনযাপন করে। সেই জীবন কেমন এ বাড়ির কেউ জানে না। অরুর সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ নেই। এ বাড়িতে অরুর ব্যবহারী প্রতিটি জিনিস নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শাহানাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, আপনার ছেলেমেয়ে কী? তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন, আমার দুই মেয়ে। এটা বলতে তার কথা আটকে যায় না বা তিনি কোনো কষ্ট বোধ করেন না। কিংবা কে জানে— হয়তো করেন, কাউকে বুঝতে দেন না। গত ঈদে অরু এসেছিল। শাহানা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন, তোর এত সাহস! তুই এ বাড়িতে আসতে পারলি? এক্ষুণি বের হ। এক্ষুণি। অরু চলে গিয়েছিল এবং আর কখনো আসে নি।

শাহানার ধারণা জহিরের সঙ্গে অরুর হয়তো কোনো যোগাযোগ আছে। এই বিষয়ে জহিরকে তিনি কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আজকাল মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে।

তরুর অস্থির ভাবটা আরো বাড়ল।

জহির ভাই এখনো বের হচ্ছে না। কী করছেন তিনি? চা খাচ্ছেন? ক'কাপ চা? এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে চা খাবার দরকারটা কী? তার ইচ্ছা করছে উঁকি দিয়ে দেখতে। ইচ্ছা করলেও যাওয়া যাবে না। সবাই ঘুমুচ্ছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করবে কে? তরু বসার ঘরে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। আর তখনি চোখে পড়ল জহির ভাই বেরুচ্ছেন। আজ তাকে অন্যরকম লাগছে। কেন অন্যরকম লাগছে? গায়ে তো সেই পুরনো হলুদ শার্ট। এরকম বিশ্রী রঙের শার্ট কেউ পরে? ক'পয়সা আর লাগে ভালো একটা শার্ট কিনতে। কত সুন্দর শার্ট আজকাল বের হয়েছে।

জহির কলিং বেলে হাত দেয়ার আগেই জানালার ওপাশ থেকে তরু বলল, জহির ভাই!

জহির জানালার পাশে এগিয়ে এসে বলল, তুমি কলেজে যাও নাই?

না। আপনি ঐ চায়ের দোকানে বসে কী করছিলেন?

দেখেছ নাকি?

হ্যাঁ, দেখেছি। আপনি ওখানে কী করেছিলেন?

চা খাচ্ছিলাম, আবার কী?

এ বাড়িতে আমরা কি চা বানাতে পারি না যে দোকানে গিয়ে চা খেতে হয়?

জহির কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, দরজা খোল তরু, জানালা দিয়ে কথা বলব?

তরু দরজা খুলল, তার মুখ ভার ভার, বিষণ্ণ।

জহির বলল, কেউ নেই না-কি? ঘর এমন চুপচাপ।

তরু করুণ গলায় বলল, এ বাড়ি এখন তো চুপচাপই থাকে। এ বাড়িতে হৈ চৈয়ের মানুষ কোথায়? বসুন জহির ভাই। কেন জানি আপনাকে দেখে আজ খুব ভালো লাগছে।

জহির লজ্জিত মুখে বলল, মামা এখনো ফেরেন নি?

উঁহুঁ। আপনাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন জহির ভাই? কেমন অচেনা অচেনা লাগছে।

চুল কেটেছি।

আপনাদের পুরুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, দুই দিন পর পর চুল কাটেন আর চেহারা বদলে যায়।

মানুষ তো আর বদলায় না।

কে জানে হয়তো বদলায়।

তোমার মনটা মনে হয় খারাপ। কিছু হয়েছে না-কি?

না, কী আর হবে।

মামি কোথায়?

ঘুমোচ্ছেন। ডাকব?

না, ডাকার দরকার নেই।

জহির খানিক ইতস্তত করে বলল, জিনিসটা কেমন দেখ তো তরু। এনগেজমেন্টের একটা আংটি কিনলাম। মানে মামা বললেন— তাই।

তরু হাত বাড়িয়ে আংটির বাক্সটি নিল। জহিরের অসময়ে আসার উদ্দেশ্য তার মনে পড়ল। আজ ষোল তারিখ, মেয়ে দেখার দিন; তরুর মনেই ছিল না।

জহির নিচু গলায় বলল, তোমাকে নিয়ে কিনতে চেয়েছিলাম, ভাবলাম তোমাকে নিয়ে গেলে তুমি শুধু দামিগুলি কিনতে চাইবে। মানে আমার তো আবার...

আংটিটা সুন্দর হয়েছে।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ, সত্যি। খুব সুন্দর।

আঙুলে লাগবে কি-না কে জানে?

লাগবে। জহির ভাই, আমি একটু পরে দেখব।

পর। দেখ আবার যেন দাগ না লাগে।

তরু একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জহিরের দিকে তাকিয়ে আংটি পরল। জহির বলল, লেগেছে?

হ্যাঁ।

টাইট হয় নি তো?

না।

অবশ্যি হলেও অসুবিধা হবে না। ওরা বলেছে ফেরত নিবে। আংটিটা এখন খুলে ফেল তরু, ঘসা টসা লাগলে দাগ পড়ে যাবে।

পড়বে না। সোনাতে অত সহজে দাগ পড়ে না। চা খাবেন জহির ভাই।

না।

ঠাণ্ডা কিছু দেব? সরবত করে দেই, লেবু আছে।

না না, কিছু লাগবে না। তুমি বসো তো।

তরু তার সামনে বসল। নিচু গলায় বলল, আংটিটা আমাকে একদম মানাচ্ছে না, তাই না জহির ভাই? গায়ের রঙ আরো ফরসা হলে মানাতো। যার গায়ের রঙ সোনার মতো তাকেই সোনার গয়নায় মানায়। আমাদের কলেজে সায়েন্স গ্রুপে একটা মেয়ে পড়ে, তার গায়ের রঙ অবিকল কাঁচা সোনার মতো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। একবার কয়েকগাছি চুড়ি পরে এসেছিল, চুড়িগুলি গায়ের রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে কোনগুলি চুড়ি বোঝা যাচ্ছিল না।

বলো কী!

তবে মেয়েটা দেখতে ভালো না। মেয়েটার দিকে তাকালে মনটা খারাপ হয়ে যায়। এত সুন্দর গায়ের রঙ, এত সুন্দর শরীর।

বলতে বলতে তরু লজ্জা পেয়ে গেল। সুন্দর শরীর কথাটা বলা ঠিক হয় নি, জহির ভাই কী মনে করলেন কে জানে।

জহির ভাই।

বলো।

সবারই তো একইরকম নাক মুখ চোখ, তবু কাউকে সুন্দর লাগে, কাউকে লাগে না কেন?

কী জানি কেন?

তরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি নিজে দেখতে তো ভালো না, এইজন্যে এটা নিয়ে আমি খুব ভাবি।

তুমি দেখতে খারাপ কে বলল?

খারাপ না, তবে সাধারণ। খুব সাধারণ।

সাধারণই ভালো।

ছেলেদের জন্যে ভালো। মেয়েদের জন্যে না। একটা মেয়ের কেমন বিয়ে হবে কী রকম বর হবে তা নির্ভর করে মেয়েটা দেখতে কেমন। মেয়েটি বুদ্ধিমতি কি-না, পড়াশুনায় কেমন, তার মনটা কেমন এইসব দেখা হবে না।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি কি বিয়ে নিয়ে খুব ভাব ?

ভাবি। আপার এ কাণ্ডের পর ভাবি। নিজের চেহারাটা আরেকটু ভালো হলে তেমন ভাবতাম না।

তোমার চেহারা খারাপ না।

তা ঠিক। খারাপ না, তবে ভালোও না।

তরু হাত থেকে আংটি খুলে বাক্সে ভরতে ভরতে বলল, বাবা বলছিলেন আজকে যে মেয়েটিকে দেখতে যাবেন সে খুব সুন্দর, তবে রোগা। জহির কিছু বলল না। তরু বলল, ওদের নাকি খুব আগ্রহ। আগের কয়েকটা বিয়ে লাগানি ভাঙানির জন্যে ভেঙে গেছে তাই...

তরু কথা শেষ না করে উঠে গেল।

জহির ঘড়ি দেখল, চারটা চল্লিশ অথচ বাইরে এখনো কড়া রোদ। আকাশে মেঘের ছিটাফোঁটাও নেই। সে ভেতরের বারান্দায় এলো। দুটো গোলাপ গাছে অসুখ ধরেছে। পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে। গাছের কষ্টটা দেখেই বোঝা যায়। গোলাপের এই অসুখটা খুব খারাপ। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কাল পরশুর মধ্যে ওষুধ এনে দিতে হবে। জহির গাছগুলির কাছে নেমে এলো। অসুস্থ পাতাগুলি ফেলে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় কিছু ছাই দিতে পারলে হতো। শহরে ছাই কোথায় পাওয়া যাবে।

তরু বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে কিছু বলতে চায়। জহির বলল, কিছু বলবে তরু ?

না।

তোমার মনটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে। কিছু হয়েছে ?

না, মাথা ধরেছে।

চোখ বন্ধ করে ঘরটা অন্ধকার করে শুয়ে থাক।

আপনার এই হলুদ রঙের শার্টটা দেখলেই আমার মাথা ধরে যায়। একদিন আপনার বাসায় গিয়ে শার্টটা পুড়িয়ে দিয়ে আসব। হাসবেন না, সত্যি সত্যি পুড়িয়ে দেব কিন্তু।

জহির দেখল তরুর মুখ থেকে বিষণ্ণ ভাবটা চলে গেছে। সে হাসছে। হাসলে এই মেয়েটিকে সুন্দর দেখায়। হাসলে সবাইকে সুন্দর দেখায়, কিন্তু এই মেয়েটিকে একটু যেন বেশি সুন্দর লাগে।

এ বাড়ির মানুষেরা কথা কম বলে। শুধু শাহানা কিছু বেশি কথা বলেন। তরু, অরু এবং মীরা এই তিন বোন তো কথাই বলে না। বোনেরা মিলে গল্প করার দৃশ্যও জহির খুব বেশি দেখে নি, তবে এই তিন বোনের মধ্যে তরু খানিকটা সহজ। বাইরের লোকজন এলে সে এগিয়ে গিয়ে গল্প করে। তাও অবশ্যি অল্প কিছুক্ষণ। মনে হয় কিছুক্ষণ গল্প করার পরই তার আগ্রহ নিভে যায়। তরু নরম গলায় বলল, জহির ভাই ?

বলো।

অসুন্দর মেয়ে হবার সবচে' বড় সমস্যা কি জানেন ?

না।

একটা অসুন্দর মেয়ে যদি কাউকে পছন্দ করে সে তা জানাবার সাহস পায় না। মনের মধ্যে চেপে রাখতে হয়।

এইসব আজেবাজে জিনিস নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় ? যাও, আমার জন্যে চা বানিয়ে আন।

শাহানার ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভাঙলে প্রথম তিনি যে কাজটি করেন তা হচ্ছে মতির মাকে বকাঝকা। আজ বকাঝকা চূড়ান্ত রকমের হতে পারে। মতির মা'রও ঘুম ভেঙেছে। সে এই বকাঝকা মোটেও গ্রাহ্য করল না। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে বলল, আফা, দেহি আমারে একফোঁটা চা দেন।

জহিরের চা খাওয়া শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বরকত সাহেব ঢুকলেন। আজ কেন জানি তাকে ক্লান্ত ও বিরক্ত লাগছে। তিনি জহিরকে দেখে বললেন, এসে পড়েছ ? মেয়ের এক বড় খালু আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বললেন, সন্ধ্যার পর যেতে। রাতে ঐ বাড়িতে খেতে বলেছে। খাওয়াটা কি ঠিক হবে ? চা মিষ্টি খাওয়া এক জিনিস আর ভাত খাওয়া অন্য জিনিস। আমি অবশ্যি হ্যাঁ-না কিছুই বলি নি। খাওয়াতে চাচ্ছে খাওয়াক। তুমি কী বলো ?

আপনি যা ভালো মনে করেন।

এরেঞ্জড ম্যারেজ এখন ভয়ঙ্কর সমস্যা। ছেলেগুলির চরিত্রের ঠিক নাই, মেয়েগুলিও তেমন। বিরাট টেনশান। তরুর একটা বিয়ে কোনোমতে দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

এখনই তরুর বিয়ে ?

হ্যাঁ, এখনই। তুমি জানো না বথা ছেলেগুলি খুব যন্ত্রণা করছে। তরু তোমাকে কিছু বলে নি ?

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, না তো!

লজ্জায় বলে নি। বলার মতো জিনিস তো না। তুমি আবার নিজ থেকে জিজ্ঞেস করো না— লজ্জা পাবে।

না, আমি কিছুই জিজ্ঞেস করব না।

জহিরের মন খারাপ হলো। বেশ মন খারাপ। সে তরুকে পছন্দ করে। অনেকখানিই করে। এই মেয়েটা মনে কষ্ট নিয়ে ঘুরছে ভাবতেই খারাপ লাগে। কী করেছে ছেলেগুলি ? খারাপ কোনো গালাগাল দিয়েছে ? নাকি গায়ে হাত টাত দিয়েছে ?

সারাদিন ঝাঁ ঝাঁ রোদ ছিল। অথচ সন্ধ্যা মেলাবার আগেই মেঘ জমে আকাশ কালো হয়ে গেল। বরকত সাহেব জহিরকে নিয়ে রাস্তায় নামতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। বরকত সাহেব বললেন, বৃষ্টি হলে বাঁচা যায়, কি বলো জহির ?

জহির চুপ করে রইল। বরকত সাহেব বললেন, অফিসে আমার মাথার উপরের ফ্যানটা ছিল নষ্ট। গরমে সারাদিন খুব কষ্ট করেছি।

বৃষ্টির ফোঁটা ঘন হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বরকত সাহেবের সঙ্গে ছাতা আছে তবে তিনি ছাতা মেললেন না। আনন্দিত গলায় বললেন, বৃষ্টিযাত্রা খুবই শুভ। তোমার এই বিয়েটা হবে বলে মনে হচ্ছে। যদি হয় তোমার জন্যেও সুবিধা। কাওরান বাজারে মেয়ের নামে ছোট্ট একটা ঘর আছে। ঐখান থেকে রেগুলার ভাড়া পাবে। চল প্রথমে কিছু মিষ্টি কিনে নিই। খালি হাতে যাওয়া ঠিক না।

দু'কেজি মিষ্টি কেনা হলো। বরকত সাহেব জহিরকে মিষ্টির দাম দিতে দিলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, মিষ্টি তো তুমি নিচ্ছ না। আমি নিচ্ছি। যার বাসায় যাচ্ছি সেই ভদ্রলোক আমার পরিচিত। আমাদের অফিসের পারচেজ অফিসার জব্বার সাহেবের ভায়রা ভাই, মেয়ের বড় খালু।

বরকত সাহেব পনেরো টাকায় একটা রিকশা নিলেন। বৃষ্টিতে রিকশা করে যাওয়ার আনন্দই নাকি আলাদা। রিকশায় উঠার পরপর মুষলধারে বর্ষণ শুরু হলো। বরকত সাহেব বললেন, ভালো বর্ষণ হচ্ছে, তাই না জাহির ?

জি মামা।

ইংরেজিতে এই ধরনের বৃষ্টিকে বলে ক্যাটস এন্ড ডগস। কেন বলে কে জানে। তুমি ভিজে যাচ্ছ না-কি ?

জহির ভিজে যাচ্ছিল, তবু বলল, না।

বরকত সাহেব বললেন, আমি ভিজে যাচ্ছি কেন তা তো বুঝলাম না। কোত্থেকে যেন হুড় হুড় করে পানি ঢুকছে।

বরকত সাহেব প্রবল বাতাসের বিপরীতেও সিগারেট ধরালেন। গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বললেন, রিকশা নিয়েছি কারণ তোমাকে কয়েকটা কথা বলা দরকার। বেবিটেক্সিতে গেলে শব্দের যন্ত্রণাতেই কিছু শোনা যেত না।

জহির শংকিত গলায় বলল, কী কথা?

ঐ মেয়ে সম্পর্কে দু'একটা কথা। ওর কিছু ইতিহাস আছে। আমি আগে জানতাম না। আজই জানলাম। মেয়ের বড় খালু বললেন। উনার কাছ থেকে সব শুনে একবার ভাবলাম মেয়ে দেখা ক্যানসেল করে দিই। বাংলাদেশে মেয়ের তো অভাব নেই, তাই না? তারপর চিন্তা করলাম, এর একটা মানবিক দিক আছে। তা ছাড়া তুমি যেমন কনসিডারেট ছেলে, সব দিক বিবেচনা করে তুমি হয়তো...

ব্যাপারটা কী মামা?

মেয়ের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল।

জহির প্রথম ভাবল সে কানে ভুল শুনছে। মেয়ের আগে বিয়ে হয়েছে মানে? এ কেমন কথা? জহির অস্পষ্ট স্বরে বলল, কী বলছেন এসব?

তুমি যা ভাবছ তা না। কাগজেপত্রে বিয়ে। কাগজেপত্রে ঠিক না, টেলিফোনে। টেলিফোনে এক সময় বিয়ের খুব চল হলো না? ছেলে বিদেশে মেয়ে দেশে— টেলিফোনে বিয়ে হয়ে যায়। তারপর মেয়ে চলে যায় স্বামীর কাছে। ঐরকম বিয়ে। ছেলে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে মেরিন বায়োলজিতে পিএইচডি করত। টেলিফোনে বিয়ে হলো। মেয়ে চলে যাবে কিন্তু ভিসার জন্যে যেতে পারে না। আমেরিকানরা ভিসা দিতে বড় ঝামেলা করে। ভিসা পেতে লাগল ন'মাস। যাবার সব ঠিকঠাক, হঠাৎ ছেলের এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত, মেয়ে যেন না আসে। যা বৃষ্টি। কী বলছি শুনতে পাচ্ছ জহির?

জি পারছি।

যাই হোক, মেয়ের যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তার সপ্তাহখানেক পর ছেলের চিঠি এসে উপস্থিত। সে এই বিয়েতে আগ্রহী নয়। তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। পুরো ব্যাপারটার জন্য সে খুবই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে পাঁচ হাজার ডলারের একটা ড্রাফট পাঠাল। মেয়ে অবশ্যি কিছুতেই তা নিবে না। মেয়ের আত্মীয়স্বজনরা মেয়ের কথা শুনল না। কাওরান বাজারে মেয়ের নামে একটা ঘর রাখল।

কতদিন আগের কথা?

বছর দুই। বিনা অপরাধে মেয়েটার শাস্তি হচ্ছে। মেয়েটার আগে বিয়ে হয়েছে এটা শুনেই সবাই পিছিয়ে যায়। কী রকম বিয়ে, কী সমাচার, কিছুই জানতে চায় না। জানলেও পিছিয়ে পড়ে। মেয়ের বাবা ক্ষমতাবান হলে ভিন্ন কথা ছিল। বাবা স্কুল মাস্টার। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। তাই আমি ভাবলাম... তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে না হয় বাদ দাও। তবে আমার কী মনে হয় জানো জহির, দুঃখ-পাওয়া মেয়ে তো, এ ভালো হবে।

জহির চুপ করে রইল।

তুমি কি মেয়ে দেখতে চাও না?

চাই।

দ্যাটস গুড। মেয়ে পছন্দ হলে বিয়ে করে ফেল। সমস্যায় পড়া একটা পরিবারকে সাহায্য করা হবে। এর ফল শুভ না হয়েই যায় না। তাছাড়া তোমার মন ভালো। এই মেয়ের জন্য একটা ভালো মনের ছেলে দরকার।

পল্লবীতে বাড়িটার সামনে তারা যখন রিকশা থেকে নামল তখন দু'জনই চুপসে গেছে। পনেরো টাকায় ঠিক করে আনা রিকশাওয়ালা চাচ্ছে পঁচিশ টাকা। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক ঘন অন্ধকার। টর্চলাইট জ্বালিয়ে এক ভদ্রলোক ছাতা হাতে এগিয়ে এলেন। বিনীত গলায় বলতে লাগলেন, বড় কষ্ট হলো। আপনাদের বড় কষ্ট হলো। গত পাঁচ বছরে এমন বৃষ্টি হয় নাই। ঘরের ভিতরে পানি ঢুকে গেছে ভাইসাব।

বসার ঘরটি ছোট।

এই ছোট এক চিলতে ঘরের ভিতর একটা সোফা সেট ছাড়াও একটা খাট। খাটের মাথার দিকে পড়ার টেবিল। পড়ার টেবিলের কোণ ঘেঁসে একটা বুকসেলফ। বুকসেলফের বই দেখে মনে হয় এ বাড়িতে রহস্য-রোমাঞ্চ-প্রেমিক কোনো পাঠক আছে। জহির বসেছে কোনার দিকে বেতের চেয়ারে। বুকসেলফের বইয়ের নাম পড়তে চেষ্টা করেছে— নরপিশাচ, ভয়ংকর রাত, তিন গোয়েন্দার অভিযান, একটি রক্তপিপাসু প্রেতের কাহিনী।

টেবিলের উপর একটা হারিকেন জ্বলছে। হারিকেন থেকে যত না আলো আসছে তারচে' বেশি আসছে ধোঁয়া। বয়স্ক একজন লোক বিরক্ত গলায় বললেন, হারিকেনটা ঠিক করে দাও না কেন? তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি বালিকা হারিকেন ঠিক করতে এসে হারিকেন নিভিয়ে ফেলল। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার। ভদ্রলোক বিরক্ত গলায় বললেন, এরা যদি একটা কাজও ঠিকমতো পারে! যাও, এই জঞ্জাল নিয়ে যাও এখান থেকে। মোমবাতি আন।

মোমবাতি আসতে দেরি হলো। সেই মেয়েটিই মোমবাতি নিয়ে এসেছে। মোমবাতি টেবিলে বসাতে বসাতে বলল, বাবা, ওনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

বরকত সাহেব বললেন, এখনই খাবার কী ? কথাবার্তা বলি।

বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, খাবার বোধহয় বেড়ে ফেলেছে। এরা কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। বললাম ঘন্টাখানিক পরে খাবার দিতে— অন্ধকারের মধ্যেই দিয়ে বসে আছে। আসুন চারটা খেয়ে নেই। আসুন, ভেতরে আসুন। আরে গাধাগুলি কি বারান্দায় আলো দেবে না ?

তিনজন খেতে বসলেন। জহির, তার মামা এবং বুড়ো এক ভদ্রলোক, যার নাম দিদার হোসেন। ইনিই মেয়ের বড় খালু। খাবার টেবিলের কোণ ঘেঁসে মাথা নিচু করে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে একপলক দেখে জহির হতভম্ব! এই কি সেই মেয়ে ? মানুষ এত সুন্দর হয় ? এত স্নিগ্ধ চেহারা কারোর হয় ? দ্বিতীয়বার তাকাবার সাহস তার হলো না। যদি দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখে আগের দেখায় ভ্রান্তি ছিল ?

দিদার হোসেন বিরক্ত গলায় বললেন, কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন মা ? মেহমানদের স্লামালিকুম দাও।

মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, স্লামালিকুম।

দিদার হোসেন বললেন, এর নাম আসমানী। তুমি খাদিমদারি কর তো মা।

লোকজন খাওয়ানোয় মেয়েটি মনে হয় খুবই আনাড়ি। জহির প্লেটে হাত ধুয়েছে; সেই পানি না সরিয়েই আসমানী সেখানে একহাতা পোলাও দিয়ে লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

দিদার হোসেন রাগী গলায় বললেন, এরা একটা কোনো কাজ যদি ঠিকমতো পারে ! এই ছেলে কি পানিভাত খাবে ?

জহির আরেক পলক তাকাল মেয়েটির দিকে। বেচারির চোখে পানি এসে যাচ্ছে। জহিরের মনটা মায়ায় ভরে গেল। মেয়েটা জহিরের প্লেটটা সরিয়ে দিতে গেল। ধাক্কা লেগে একটা পানির গ্লাস উল্টে গেল।

দিদার হোসেন তিক্ত মুখে বললেন, এ বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ গাধা। আসমানী, তুই যা তো এখান থেকে।

মেয়েটি পালিয়ে বাঁচল। জহির বুঝতে পারছে রান্নাঘরে ঢুকে এই মেয়েটা হাউমাউ করে কাঁদবে। আহা বেচারি!

দিদার হোসেনের মেজাজ আরো খারাপ হলো। কিছুক্ষণ পর পর ছোটখাট বিষয় নিয়ে তিনি হৈচৈ করতে লাগলেন, আচ্ছা, লেবু কে কেটেছে ? একটা লেবুও কি এরা ঠিকমতো কাটতে জানে না ? এইসব কী ? এটা কি মানুষের বাড়ি না আস্তাবল ?

রাত দশটায় ফেরার ঠিক আগে আগে বরকত সাহেব বললেন, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে। আমরা একটা আংটি নিয়ে এসেছি। আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে আংটিটা আসমানী মা'র হাতে পরিয়ে দিতে পারি।

দিদার হোসেন আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে অশ্রু চিকচিক করতে লাগল। যাঁরা খুব সহজে রাগতে পারেন, তাঁরা খুব সহজে আনন্দিত হতে পারেন। দিদার হোসেন গাঢ় স্বরে বললেন, এই মেয়েটিকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। সে যে কত ভালো মেয়ে আপনারা যত দিন যাবে তত বুঝবেন। মেয়েটা দুঃখী। দুঃখী মেয়েটাকে আপনি সুখ দিলেন। আল্লাহ আপনার ভালো করবে।

আংটি নেবার জন্যে মেয়েটা বসার ঘরে এলো। জহিরের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আরেকবার মেয়েটির দিকে তাকাতে। বড় লজ্জা লাগছে। কেউ না দেখে মতো সে কি একবার তাকাবে ?

জহির তাকাল। আশ্চর্য! মেয়েটিও তাকিয়ে আছে। কী গভীর মায়া, কী গভীর ভালোবাসা মেয়েটির চোখে। চোখ দু'টি ফোলা ফোলা। আহা, বেচারি বোধহয় কাঁদছিল।

করিম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কিসের কার্ড জহির ?

জহির কোনো শব্দ করল না। মাথা নিচু করে ফেলল। নিজের বিয়ের কার্ডের কথা মুখ ফুটে বলা যায় না, লজ্জা লাগে। করিম সাহেব খাম খুলতে খুলতে বললেন, বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল ?

জি স্যার।

ঐ মেয়ে ? মালিবাগ না কোথায় যেন থাকে বলছিলে ?

যাত্রাবাড়িতে থাকে স্যার।

ও আচ্ছা, যাত্রাবাড়ি। ভেরি গুড। খুবই খুশির সংবাদ।

মেয়ে স্যার ইন্টারমিডিয়েট পাস। হায়ার সেকেন্ড ডিভিশান পেয়েছে। পাঁচ শ' বিরাশি, ফোর্থ পেপার থাকলে ফার্স্ট ডিভিশান পেয়ে যেত। সায়েন্স গ্রুপ স্যার।

ভালো, খুব ভালো। বিয়ে কবে ?

সামনের মাসের বারো তারিখ। এই মাসেই হতো, এই মাসটা আবার আসমানীর জন্মমাস।

মেয়ের নাম বুঝি আসমানী ?

জ্বি। ডাকনাম বুড়ি। আদর করে ছোটবেলায় ডাকতে ডাকতে বুড়ি নাম হয়ে গেল।

জহিরের হয়তো আরো অনেক কথা বলার ছিল। বলা হলো না। করিম সাহেব সময় দিতে পারলেন না। তাঁর হাতে অনেক কাজ। জহিরের শার্টের পকেটে আসমানীর একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি। তার খুব ইচ্ছা স্যারকে ছবিটা দেখায়। সেই সুযোগ হলো না। করিম সাহেব বললেন, দেখ তো জহির, ইদ্রিস এসেছে কি-না ? ওকে ক্যালকুলেটারের ব্যাটারি আনতে পাঠালাম। এখনো খোঁজ নেই। এদের বিন্দুমাত্র রেসপনসিবিলিটি যদি থাকে!

জহির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইদ্রিসের খোঁজে গেল। আসমানীর ছবি গত চারদিন ধরে সে পকেটে নিয়ে ঘুরছে। কাউকে দেখাতে পারছে না। কেউ দেখতে চাইলে দেখানো যায়। না চাইলে তো আর পকেট থেকে ছবি বের করা যায় না। তবু টিফিন টাইমে সদরুল সাহেবের সামনে পকেট থেকে কাগজ বের করার সময় এমনভাবে বের করল যে ছবিটা বেরিয়ে পড়ল। সদরুল সাহেব বললেন, বাহ্ সুন্দর মেয়ে তো ! কে ?

ব্যস্, এই পর্যন্তই। একবার 'কে' বলাতেই তো জহির হড়হড় করে সব বলে দিতে পারে না। চক্ষুলজ্জা আছে না ?

কারোর কোনো উৎসাহ নেই। কেউ কিছু জানতে চায় না। বিয়ের কার্ডটা দেখেও কিছু বলে না।

জহির ভেবেছিল অফিসের সবাইকে দাওয়াত করবে। সেই ভাবনা বাতিল করতে হলো। বৌভাত করবে, টাকা কোথায় ? খাওয়া-দাওয়া বাবদ আলাদা আট হাজার টাকা জমা করা ছিল। সেই টাকাটা এক মাসের কথা বলে ট্রান্সপোর্ট অফিসার সদরুল সাহেব ধার নিলেন। পাঁচ মাস হয়ে গেল। টাকাটা ফেরত পাওয়া যায় নি। এখন যদি না পাওয়া যায় তাহলে বৌভাত হবে না। সদরুল সাহেব কি দয়া করবেন ? এ বিপদে টাকাটা তাকে ফেরত দেবেন ?

জহির কার্ড আগাতে আগাতে বলল, স্যার, আমার বিয়ের কার্ড।

সদরুল সাহেব না দেখেই বললেন, ভেরি গুড।

জহির হাত কচলাতে কচলাতে বলল, মুরুব্বি কেউ নেই স্যার। আপনিই মুরুব্বি। আসবেন।

আসব, অবশ্যই আসব। অফিসসুদ্ধ দাওয়াত করেছ না-কি ?

জি-না স্যার। টাকা-পয়সার টানাটানি, অল্প কয়েকজনকে বলেছি।

সদরুল সাহেব ফাইলে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়লেন। জহিরের দাঁড়িয়ে থাকা না-থাকা এখন আর কোনো ব্যাপারই যেন না। জহির ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার, একটা ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

সদরুল সাহেব বিরক্তমুখে বললেন, পরে বললে হয় না ? এখন খুব ব্যস্ত। ফাইল দিয়েছে দেড়টায়, বলেছে তিনটার মধ্যে ক্লিয়ার করতে— আরে আমি কি আলাউদ্দিনের দৈত্য না-কি ?

জহির বলল, টাকাটার ব্যাপার মনে করিয়ে দেবার জন্য স্যার, বলেছিলেন বিয়ের আগে...

কিসের টাকা ?

জহিরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সদরুল সাহেব এসব কী কথা বলছেন ?

জহির বলল, আপনি নিয়েছিলেন স্যার।

ও আচ্ছা, Now I recall. দেখি কী করা যায়। কাল একবার মনে করিয়ে দিও। কত নিয়েছিলাম যেন, আট ? আমি দশ ম্যানেজ করে দেব। বিয়েশাদিতে টাকা-পয়সা বেশি লাগে।

জহির বিশেষ ভরসা পেল না। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, কাল কখন মনে করিয়ে দেব স্যার ? এগারোটার দিকে ?

আমার এমনিতেই মনে থাকবে, তবু ইন কেইস যদি ভুলে যাই তুমি বরং সাড়ে দশটার দিকে মনে করিয়ে দিও।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় খবর নিয়ে জানা গেল সদরুল সাহেব আসেন নি। তিনদিনের ছুটি নিয়েছেন। ক্যাজুয়েল লিভ। জহিরের প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। বৌভাতের আইডিয়াটা বাতিল করা ছাড়া কোনো উপায় রইল না। কার্ড থেকে— বৌভাত : আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টার : দুপুর দেড়টা— এই অংশটা কেটে বাদ দিতে হচ্ছে। ওদের এগার শ' টাকা অ্যাডভান্স দেয়া আছে। এ টাকা এখন ফেরত পাওয়া যাবে কি-না কে জানে। এদেশে রিফান্ডেবল টাকা বলে কিছু নেই। যে-টাকা একবার পকেট থেকে বের হয় সে-টাকা আর ফেরত আসে না। জহির অফিস থেকে সদরুল সাহেবের বাসার ঠিকানা নিয়ে নিল। একবার যাবে ওদিকে। লাভ হবে না, তবুও যাওয়া।

অরুদের বাসাও ঐদিকে, ওকেও একটা কার্ড দিয়ে যাওয়া দরকার। অরু অবশ্যি বিয়েতে আসবে না। সে এখন আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে দেখা হয় এমন কোনো জায়গায় যায় না।

অরুরা থাকে সাততলায়। উঠতে উঠতে বুকে হাঁফ ধরে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে। সবচে' কষ্ট হয় যখন এদ্দুর উঠবার পর দেখা যায় অরুরা নেই। আজ ছিল, কলিং বেল টিপতেই অরু দরজা খুলে দিল, বিরক্তমুখে বলল, কী ব্যাপার ? জহির বলল, সন্ধ্যাবেলা ঘুমুচ্ছিলে ?

হ্যাঁ ঘুমুচ্ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা ঘুমুনো যাবে না এমন কোনো আইন নেই। জহির ভাই, আপনি কোনো কাজে এসেছেন, না লৌকিকতা ?

আছে একটা ছোটখাট কাজ।

অরু হাই তুলে বলল, কাজটা এখানে দাঁড়িয়ে সেরে ফেলা যায় না ? ভিতরে ঢুকলেই আপনি কথাবার্তা বলবেন। শুধু শুধু সময় নষ্ট। আমি দু'রাত ঘুমুই নি।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, ঘুমাও নি কেন ?

সত্যি সত্যি জানতে চান ?

হ্যাঁ।

হাইড্রোজেন খেলেছি।

হাইড্রোজেন খেলেছি মানে ? হাইড্রোজেন আবার কী খেলা ?

আপনি বুঝবেন না। কী বলতে এসেছেন বলে চলে যান। আমার ঘুম কেটে যাচ্ছে।

ঘরে আর কেউ নেই ?

না।

আমি বরং বসার ঘরে চুপচাপ বসে থাকি, তুমি ঘুমোও। ঘুম ভাঙলে কথা বলব।

কথা বলতেই হবে ?

হ্যাঁ।

বেশ, তাহলে বসুন।

জহির বসে আছে। অরু ঘুমুতে গেল। এটা যেন কোনো ব্যাপারই না। অরু খুব গোছানো মেয়ে, অথচ ড্রইংরুমের অবস্থা কী করে রেখেছে। মনে হচ্ছে এক সপ্তাহ ঝাঁট পড়ে নি। একটা মুরগির হাড় অসংখ্য লাল পিঁপড়া টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সোফার সাদা কাপড়ে কে যেন চা ঢেলে দিয়েছে, যা ধোঁয়ার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। টেবিলের উপর একটি ইংরেজি পত্রিকা। সেই পত্রিকায় বিশালবক্ষা একটি তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। তাকাতে খারাপ লাগে, আবার চোখ ফিরিয়ে নিতেও ইচ্ছে করে না।

পুরোপুরি তিন ঘণ্টা ঘুমুলো অরু। তিন ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকা খুব কষ্টের। আবার অরুকে কিছু না বলে চলেও যাওয়া যাচ্ছে না। অরুর শোবার ঘরের দরজা খোলা। জহির বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে আবিষ্কার করল, অরু শুধু একটা শাড়ি দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছে। গায়ে ব্লাউজ বা কাঁচুলি কিছুই নেই। অরুর মতো মেয়ে এমন ভঙ্গিতে ঘুমুবে এটা কল্পনাও করা যায় না। জহির চেয়ার বদলে বসল। যাতে অরুকে দেখতে না হয়।

ও মা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে! সরি, অনেকক্ষণ ঘুমালাম। আরো অনেকক্ষণ ঘুমাতাম, মশা কামড়াচ্ছিল বলে ঘুমুতে পারলাম না। এমন মশা হয়েছে।

অরু জহিরের সামনের চেয়ারে বসে হাই তুলল। নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার বিয়ে, তাই তো? পকেটে কার্ড দেখে বুঝতে পারছি। এটা বলার জন্যই এসেছেন?

হুঁ।

বলে চলে গেলেই হতো। খামোখা কষ্ট করলেন। বিয়েটা হচ্ছে কবে?

বারো তারিখ।

ভালো কথা। বিয়ে করুন। বিয়ে করে দেখুন একটা মেয়ের সাথে ঘুমুতে কেমন লাগে।

জহির হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। অরু এসব কী বলছে? ওর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে? হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। উল্টাপাল্টা কথা মনে আসে।

জহির বলল, আজাহার সাহেব কোথায়?

জানি না কোথায়!

কখন আসবেন?

তাও জানি না। আসবে হয়তো একসময়। আবার না-ও আসতে পারে। মাঝে মাঝে সে আসে না। আগের স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমুতে যায়। ফরম্যাল ডিভোর্স তো হয় নি, রাত কাটাতে অসুবিধা নেই। আমাকেও ছাড়বে না, ওর স্ত্রীকেও ছাড়বে না। আমও থাকবে, আবার বস্তাও থাকবে। হি-হি-হি।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার শরীর খারাপ অরু?

না, গা একটু ভারি হয়েছে। এছাড়াও দু'একটা লক্ষণ দেখে মনে হয় কনসিভ করেছি। এখনো টেস্ট করি নি। আচ্ছা জহির ভাই!

হুঁ।

আমি আপনার সঙ্গে 'তুমি তুমি' করে বলতাম, না 'আপনি আপনি' করে বলতাম? আমি পুরোপুরি কনফিউজড বোধ করছি। মনে পড়ছে না।

তোমার সঙ্গে আমার তেমন কথাই হতো না।

দ্যাটস ট্রু।

তবে 'আপনি' করেই বলতে, 'তুমি' বলতে না।

তাও ঠিক। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে 'তুমি' করে বলব। আপনার কি কোনো অসুবিধা আছে?

জহির কী বলবে বুঝতে পারছে না। মেয়েটার কি কোনো সমস্যা হয়েছে? বড় ধরনের কোনো সমস্যা? মাথা ঠিক আছে তো?

অরু হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি' ডাকের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের ব্যাপার আছে, এই জন্যেই 'তুমি'। এখন 'তুমি' বললে কারো কিছু বলার নেই। কারণ আপনার তো বিয়ে হয়েই যাচ্ছে। আমার এখন কোনো বন্ধু নেই জহির ভাই, একজন বন্ধু দরকার।

জহির শংকিত গলায় বলল, আজাহার সাহেবের সঙ্গে তোমার কি ঝগড়া চলছে?

মোটেই না। সে তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এখানে আসে, মাঝে মাঝে হাইড্রোজেন খেলে। আমিও খেলি। ওরা হুইস্কি-টুইস্কি খায়। আমি দেখি, ভালোই লাগে।

কী বলছ এসব?

আহা সব দিন তো খায় না। এসব খেতে পয়সা লাগে। এত পয়সা পাবে কোথায়? একেকটা বোতলের অনেক দাম। সাতশ' মিলিলিটারের একটা বোতলের দাম আটশ' নশ' পড়ে যায়। ব্ল্যাক লেভেল হলে তো কথাই নেই।

জহির ভয়ে ভয়ে বলল, অরু, তুমি নিজেও কি হুইস্কি-টুইস্কি খাও?

অরু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মাঝে মাঝে খাই। এমন কোনো মজাদার কিছু না। তবে খানিকটা খেলে কী হয় জানেন, খালি কথা বলতে ইচ্ছে করে। তখন বেশ মজাই লাগে। এই যে আপনার সঙ্গে এত কথা বলছি এর কারণ কি জানেন? আপনি আসার আগে আগে আধ গ্লাস হুইস্কি খেয়েছি। আধ গ্লাস মানে কত পেগ জানেন? এবাউট ফোর। আপনি তো নিতান্তই বোকা, তাই গন্ধ থেকে কিছু টের পান নি।

জহির পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। অরুর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। শেষ দেখা তিন মাস আগে। এই তিন মাসে এই অবস্থা? আজাহার সাহেবের সঙ্গে তার কি বনিবনা হচ্ছে না? এই অবস্থায় অরুর কি উচিত না...

জহির ভাই?

হুঁ।... আচ্ছা, আজাহার সাহেব সাধারণত ক'টার দিকে আসেন?

ঠিক নেই। মাঝে মাঝে অনেক দেরি করে। আবার মাঝে মাঝে আসেও না। আজ মনে হচ্ছে আসবে না। আজ এই বাড়িতে একা একা থাকব।

একা একা থাকতে ভয় লাগে না ?

ভয় লাগলেই বা কী করব ? আপনি কি থাকবেন আমার সঙ্গে ? আছে আপনার এই সাহস ? না নেই। রাত আর একটু বাড়লেই আপনি বিদেয় হবেন। আপনি কি মনে করেন আমি বুঝতে পারি না, কেন আপনি ঐ চেয়ারটি পাল্টে এই চেয়ারে বসেছেন ? যাতে আমাকে এলোমেলো অবস্থায় দেখতে না হয়। আপনি কি ভাবছেন আপনার এই আচরণের কারণে আপনাকে আমি অতি ভদ্র, অতি ভালো একজন মানুষ বলে ভাবছি ? মোটেই না। আমি আপনাকে ভাবছি সাহস-নেই একজন মানুষ হিসেবে। আপনার মতো সাহস-নেই মানুষ যেমন আছে, আবার খুব সাহসী মানুষও আছে। জহির ভাই, আপনি কি একজন সাহসী মানুষের গল্প শুনবেন ?

আজ বরং উঠি। আজ মনে হচ্ছে তোমার শরীরটা ভালো না।

আজ আমার শরীর খুবই ভালো আছে। সাহসী মানুষের গল্পটা আপনাকে বলি, আপনি শুনুন। একদিন হলো কী— ওরা কয়েকজন মিলে তাস খেলছে। আমি রান্নাঘরে ওদের জন্যে চা বানাতে গিয়েছি। তখন ওর এক বন্ধু এসে বলল, দিয়াশলাই দিন তো ভাবি। দিয়াশলাই দিলাম। সে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, ভাবি, আপনার পেটে ঐটা কি কাটা দাগ ? মাই গড। কী করে কাটল ? বলেই নাভির উপর হাত দিল।

জহির স্তম্ভিত হয়ে বলল, তুমি কী করলে ?

আমি বললাম, আমার হার্টের কাছাকাছি এর চেয়েও গভীর একটি ক্ষতচিহ্ন আছে। একদিন আসবেন, আপনাকে দেখাব।

জহির হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আজাহার সাহেব ঢুকলেন। হাতে বাজারের ব্যাগ। বাজারের ব্যাগের ভেতর থেকে একটি ইলিশ মাছ উঁকি দিচ্ছে। বেশ কিছু আনাজপাতিও দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আরে জহির সাহেব— আপনি! কখন এসেছেন ?

অনেকক্ষণ।

বিয়ের খবর দিতে এসেছেন, তাই না ?

হ্যাঁ।

অরুকে কি আপনার স্ত্রীর ছবি দেখিয়েছেন ?

অরু বিরক্ত গলায় বলল, জহির ভাই বুঝি স্ত্রীর ছবি নিয়ে ঘুরছেন ?

অফকোর্স! সমস্ত পুরুষ যখন বিয়ের দাওয়াত দিতে যায় তখন তাদের বুক পকেটে থাকে স্ত্রীর ছবি। জহির সাহেব, ছবি বের করুন। ওয়ান-টু-থ্রি...।

জহিরের মানুষটাকে পছন্দ হচ্ছে।

এতক্ষণ অরুর সঙ্গে কথা বলে বুকের মধ্যে কেমন আতংক ধরে গিয়েছিল। এখন আর সেই আতংক সে বোধ করছে না। মনে হচ্ছে অরুর অনেক কথাই বানানো। মেয়েরা অনেক কিছু বানায়। অরুর মুখও কেমন হাসি হাসি দেখাচ্ছে।

আজাহার বলল, কী ভাই, ছবি দেখান।

জহির ছবি বের করল।

অরু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মেয়েটা কি সত্যি এত সুন্দর ?

আজাহারের দিকে ছবিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দেখ দেখ, একটা পারফেক্ট ছবি। এ পারফেক্ট ফেস।

আজাহার দেখল।

হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ, পারফেক্ট ফেস তো বটেই। তবে চিবুকের তিলটা আমার মনে হয় বানানো। যে ফটোগ্রাফারের দোকানে তোলা হয়েছে সেই ফটোগ্রাফার নিজেই এটা বসিয়ে দিয়েছে। যেখানে তিলটা প্রয়োজন প্রকৃতি বেছে বেছে ঠিক সেইখানেই তিল দিয়েছে, এটা বিশ্বাস করা শক্ত।

যুক্তি শুনে জহির মুগ্ধ হয়ে গেল। আজাহার সাহেব মানুষটা তো অসম্ভব বুদ্ধিমান।

জহিরকে রাতের খাবার খেয়ে তারপর আসতে হলো। আজাহার সাহেব ছাড়লেন না। বললেন, আপনার বোনের রান্না যে কত খারাপ এটা টেস্ট না করে আপনাকে যেতে দেব না।

খাওয়ার টেবিলে আজাহার সাহেব মজার মজার সব গল্প বলতে লাগলেন। একটি গল্প রামকৃষ্ণ পরমহংসের। বানর শিশু এবং বিড়াল শিশুর গল্প। জহিরের খুব ভালো লাগল। আহা, এই মানুষটা কত কিছু জানে! অরু কি গল্প শুনে শুনেই লোকটির প্রেমে পড়েছিল ? শুধুমাত্র গল্প বলেই কি কেউ কাউকে ভোলাতে পারে ?

নিশ্চয় পারে। না পারলে এই লোক কী করে ভোলাল ? আধবুড়ো একজন মানুষ। চুলে পাক ধরেছে। একটি চোখ ছোট আর একটি চোখ বড়। ঠোঁট দুটি ভারি। দাঁত অসমান। কিন্তু কথা যখন বলেন মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। কত রকম ক্ষমতাই না মানুষের থাকে!

জহির সাহেব।

জি।

অরুর কাছ থেকে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। আপনার জীবনের দু'টি না-কি উদ্দেশ্য?

জহির অবাক হয়ে তাকাল। এরকম কথা সে কখনো শুনে নি।

আজাহার সাহেব বললেন, শুনলাম প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের সেবা করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো অন্যের কাছ থেকে কোনো সেবা না নেয়া। এই যে এখন বিয়ে করছেন, আপনি কি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সেবা নেবেন না?

অরু বিরক্ত গলায় বলল, খামোখা বকবক করবে না। কথা বলার জন্যেই শুধু কথা বলা— এটা আমার খুব অপছন্দ।

সরি। আচ্ছা জহির সাহেব?

জি।

আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি?

জি করুন।

মজার ধাঁধা। এ দেশেরই একজন নৃপতির নাম বলুন যিনি সিংহাসনে বসেই হুকুম দিয়েছিলেন— যার গায়ে সামান্যতম রাজরক্ত আছে তাকেই যেন হত্যা করা হয়। তিনি এটা করতে চাইলেন সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্যে। তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। রাজা তখন প্রধান সেনাপতিকে বললেন, এমন কেউ কি আছে এখনো যার দেহে রাজরক্ত প্রবাহিত? প্রধান সেনাপতি বললেন, আপনার নিজের গায়ে রাজরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, কাজেই আমি আপনার হুকুম মতোই আপনাকেও হত্যা করব। এই কাছে এসেছি— বলেই প্রধান সেনাপতি রাজাকে হত্যা করলেন এবং ঘোষণা করলেন— পৃথিবীতে আর রাজরক্ত বলে কিছু নেই। এখন জহির সাহেব আপনি বলুন, ঐ রাজার নাম কী? এবং ঐ সেনাপতির নামই বা কী?

আমি জানি না। এরকম অদ্ভুত গল্প আমি আজ প্রথম শুনলাম। রাজার নাম কী?

তা বলব না। আপনি খুঁজে বের করুন। এরকম মজার মজার গল্প বলে আমি মানুষকে ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট করি। আমার টেকনিকটা চমৎকার না?

জি চমৎকার।

খাওয়া-দাওয়ার পর আজাহার জাহরকে নামিয়ে দিতে চললেন। সাততলা ভেঙে নিচে নামার কোনো দরকার নেই। তবু তিনি যাবেনই। অরু বলল, জহির ভাই, ওকে আপনার সঙ্গে যেতে দিন— ও সম্ভবত আপনাকে কিছু বলতে চায়। নয়তো ওর মতো অলস লোক সিঁড়ি ভাঙত না।

রাস্তায় নেমে আজাহার বললেন, সিগারেট খাবেন জহির সাহেব? যদি খেতে চান দু'টি সিগারেট কিনুন। ডাক্তার আমার জন্য সিগারেট নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কাজেই আমি এখন নিজে সিগারেট কিনি না। অন্যে দিলে খাই।

জহির দুটা সিগারেট কিনল।

জহির সাহেব?

জি।

অরুর কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে মনে হয় আপনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। কথাটা আশা করি মিথ্যা না।

মিথ্যা বলার দরকার পড়ে না। দরকার পড়লে হয়তো বলব।

আসুন, আপনার সঙ্গে একটু হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

বলুন।

অরুর সঙ্গে আপনার কি খুব অন্তরঙ্গতা ছিল?

জি-না।

আজাহার সিগারেটে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন, জহির সাহেব, ওর সঙ্গে আপনি কি কখনো ঘুমিয়েছেন?

আমি আপনার কথা বুঝলাম না।

না বোঝার মতো আমি তো কিছু বলছি না— Have you made love with her?

জহির চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। আজাহার সাহেব অল্প হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। এই জিনিস কখনো ঘটে নি। অরু কিন্তু আমাকে বলে। সম্ভবত আমাকে হার্ট করতে চায় বলেই বলে। আমি অবশ্যি সহজে হার্ট হই না। শারীরিক শুচিতা নিয়ে আমার খুব মাথাব্যথা নেই। আমার চেহারাটা ওল্ড ফ্যাশান্ড, তবে আমি মানুষ ওল্ড ফ্যাশান্ড নই। I am a modern man, জহির সাহেব!

জি।

আপনি যখন ওদের বাসায় থাকতেন, কোথায় থাকতেন ?

ওদের বসার ঘরে।

ভেতর থেকে ঐ ঘরের দরজা বন্ধ হয় না—তাই না ?

জি।

অরু সেই কথাই বলছিল। তার বর্ণনা, তার বলার ভঙ্গি সবই এত বিশ্বাসযোগ্য যে...। আপনি কি বাসে যাবেন ? যদি বাসে যান তাহলে এটাই বাসস্ট্যান্ড। বাসের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি তাহলে যাই। আমি আপনার বিয়েতে থাকব। I will be there. অরু আসবে কি-না আমি জানি না।

আজকের সকালটা এত সুন্দর কেন ?

ঘুম ভাঙতেই আসমানীর চোখ পড়ল আকাশে। জানালার ফাঁক গলে ছোট্ট একটা আকাশ, কিন্তু এ আকাশ ছোট্ট না। বিশাল আকাশ। যে-কোনো বিশাল কিছুর সামনে দাঁড়ালে মন কেমন করতে থাকে। শুধু আকাশের সামনে মন কেমন করে না, কারণ আকাশ দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে গেছে। তবে আজ আসমানীর মন কেমন করছে। কান্না কান্না পাচ্ছে।

তার মামাতো বোন এসে বলল, আপু, ঘুমোচ্ছ ?

আসামানী চোখ বন্ধ করে রাখল। যেন সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে। সে কাউকে জানতে দিতে চায় না যে সে সারারাত ঘুমোয় নি। সারারাত জেগে কাটিয়েছে। বিদেশে থাকা ঐ ছেলেটির সঙ্গে তার যেদিন বিয়ে হলো সেদিন রাতেও এই অবস্থা। সারারাত সে জেগে, এক ফোঁটা ঘুম নেই। অবশ্যি ঐ রাতে সে একা না, বাড়ির সবাই জেগে ছিল। সবাই নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করছিল। এর মধ্যে তার এক দূরসম্পর্কের ফুপাতো ভাই সাদা কাপড় পরে ভূত সেজে তাদের ভয় দেখাল। কত না কাণ্ড হলো সেই রাতে! আহা, ঐ বেচারা ফুপাতো ভাইটা বেঁচে নেই। পরের বছরই তিনদিনের জ্বরে মারা গেল। ও বেঁচে থাকলে আজও এসে কত হৈচৈ করত। ভালো ভালো মানুষগুলি, যাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, যারা সব সময় পৃথিবীর সবাইকে আনন্দ দিতে চায়, তাদেরকে এত সকাল সকাল পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় কেন ? ভাবতে ভাবতে আসমানীর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল।

আপু, সবাই রাগ করেছে। দুলাভাই কিন্তু চলে আসবে।

ভারি লজ্জা লাগছে আসমানীর। এখনো বিয়ে হয় নি, অথচ 'দুলাভাই' ডাকছে। আজ ঐ লোকটার এ বাড়িতে নাশতা করার কথা। নাশতার পর দু'জন মিলে কিছু কেনাকাটা করবে। যেমন ওর জন্য পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং স্যুটের কাপড় কেনা হবে। আসমানী কিনবে তার বিয়ের শাড়ি। আজকাল নাকি নতুন

নিয়ম হয়েছে— এইসব কোনাকাটাগুলি হবু স্বামী-স্ত্রী একত্রে করে। এই কেনাকাটা করতে করতে সামান্য পরিচয় হয়। দুপুরে দুজন একত্রে বসে খায়। দেশটা কী সুন্দর করেই না বদলাচ্ছে। দু'জনে মিলে এই প্রথম কিছু কেনা— এরচে' সুন্দর আর কী হতে পারে ?

আসমানীর মামি বললেন, তোর মুখ দিয়ে তো কোনো কথা বের হয় না। কম দামি শাড়ি গছিয়ে দিতে চাইলে রাজি হবি না, ব্লাউজ পিস দর্জির কাছে দিয়ে আসবি। স্যান্ডেলের মাপ দিবি। তুই আগে জিজ্ঞেস করে নিবি, তোমার বাজেট কত ?

আসমানীর মামা বললেন, ওর বাজেট কি আর লাখ টাকা হবে না-কি ? খামোখা এসব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই।

মামি বললেন, খালি হাতে তো আর বিয়ে করছে না। এইসব মিনমিনে ধরনের ছেলেরা বিয়ের টাকা ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে জমানো শুরু করে। বাইরে থেকে মনে হয় ফকির।

আসমানীর মামা ওদের দু'জনের জন্যে একটা গাড়ি জোগাড় করে দিয়েছেন। পুরনো একটা ভোক্সওয়াগন। সারাদিন থাকবে। ড্রাইভারকে বলা আছে। গাড়িটার একটাই সমস্যা— মাঝে মাঝে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়।

আসমানীকে অনেকরকম উপদেশও দেয়া হলো, যেমন ছেলে হয়তো বলবে, আমাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে দাও, আমি কিনে নেব— তুই রাজি হবি না— যা কিনবি দরদাম করে কিনবি। তোর কাছে কত টাকা আছে শুরুতেই জানতে চাইবে— বলবি না কিন্তু।

আজ জহিরকে দেখে আসমানীর বুকটা ধক করে উঠল। বেচারার মুখটা এত শুকনো কেন ? কী হয়েছে ? আসমানী আজ তৃতীয়বারের মতো তাকে দেখছে। আজও তার গায়ে ঐ হালকা নীল শার্টটা। ঐ নীল শার্ট ছাড়া কি বেচারার আর কোনো শার্ট নেই ? আচ্ছা আমি ওকে আজ পছন্দ করে কয়েকটা শার্ট কিনে দেব।

গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যে জহির ইতস্তত করে বলল, আসমানী, একটা সমস্যা হয়েছে।

আসমানী চোখ তুলে তাকাল, কিছু বলল না। কী সমস্যা হয়েছে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। নিজ থেকে বলবে।

আমার এক মামাতো বোন আছে, ওর নাম অরু। ও গতকাল আমার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা নিয়ে গেছে। ওর কী নাকি সমস্যা।

আসমানী ক্ষীণ গলায় বলল, কী সমস্যা ?

গুছিয়ে বলে নাই। স্বামীর সাথে বনিবনা হচ্ছে না। হয়তো আলাদা থাকতে চায়। আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি। কাঁদতে কাঁদতে টাকাটা চাইল, দিয়ে দিলাম।

আজ তাহলে কী করবেন ? চলে যাবেন ?

পছন্দ করে রাখি, পর এক সময়...

আসমানী বলল, আমার জিনিসগুলি থাক। আপনারগুলি কিনে ফেলি।

জহির অবাক হয়ে বলল, আমার কী জিনিস ?

পায়জামা, পাঞ্জাবি, স্যুটের কাপড়...।

আরে কী যে বলো, আমি স্যুটের কাপড় কিনব না-কি ? আমি হচ্ছি কেরানি মানুষ।

কেরানি মানুষরা বুঝি স্যুট পরে না ?

পরে। না পরলেও হয়, না পরাটাই ভালো।

আসমানীর কাছে জহিরকে খুব লাজুক বলে মনে হচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, বোকা বলেও মনে হচ্ছে না। অথচ বাসার সবাই বলছিল— ছেলেটা বোকা টাইপের। আসমানীর ফুপু তো খুব খারাপ ভঙ্গিতেই বলেছিলেন— ভেন্দা। রূপ দেখে আর হুঁশ নাই। সারাক্ষণ হাঁ করে আছে। এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে কপালে দুঃখ আছে। এমন দুঃখ যে দুঃখের আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

ঘণ্টাখানিক দু'জন নিউমার্কেটে এলোমেলো ঘুরল। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজন ছেলে, যে ছেলে দু'দিন পর তার স্বামী হবে, তাকে নিয়ে ঘুরতে কেমন লাগে আসমানী বুঝতে চেষ্টা করছে, পারছে না। তবে একটা জিনিস সে বুঝতে পারছে— মানুষটার সঙ্গে তার কথা বলতে ভালো লাগছে, কথা বলতে ইচ্ছাও করছে।

আসমানী বলল, নীল রঙ বুঝি আপনার খুব পছন্দ ?

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, কই, না তো !

এই নীল শার্টটা পরে রোজ আসেন।

জহির কিছু বলল না। আসমানী বলল, আসুন আপনার জন্যে কয়েকটা শার্ট কিনি। চকলেট রঙের শার্ট আমার খুব পছন্দ। আপনার কি চকলেট রঙের কোনো শার্ট আছে ?

না।

আসুন না একটা কিনি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সবরকম শার্ট ঢাকা শহরে আছে, শুধু চকলেট রঙের শার্টই নেই। আসমানী ক্লান্তিহীন হাঁটল— এ দোকানে ঢুকল, ও দোকানে ঢুকল। কোথাও পাওয়া গেল না।

দুপুরে তারা গেল এক চীনে-রেস্তোরাঁয়। অন্ধকার অন্ধকার ঘর। ভালো করে মুখও দেখা যায় না। জহির অবশ্যি এর আগেও বেশ কয়েকবার এ রেস্তোরাঁতেই এসেছে। এসেছে অরুর সঙ্গে।

মাঝে মাঝে অরুর খুব বাজারের নেশা হতো। স্কলারশিপের টাকা জমিয়ে কিছু টাকা হলেই সে বাজারে যাবে। সঙ্গে যাবে জহির।

অরু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলবে, জহির ভাই, আমার জিনিসপত্রগুলি ক্যারি করবার জন্যে আমার একজন গাধা দরকার। সঙ্গে চলুন তো। গাধা বলায় আপনি আবার কোনোরকম মানসিক কষ্ট বোধ করবেন না। আমার কাছে গাধা কোনো গালাগালি নয়। গাধা হচ্ছে— শান্ত, নিরীহ, ভদ্র এবং কষ্টসহিষ্ণু একটি প্রাণী। নিজের জন্যে যে তেমন কিছু কখনো চায় না। সবসময় চায় অন্যকে সুখী করতে। আপনি যেমন আমাকে সুখী করতে চান, তাই না ? আপনি চান না আমি সুখী হই ?

হ্যাঁ চাই।

এ জন্যেই গাধা বললাম। বুঝলেন জনাব, রাগ করবেন না।

একগাদা বাজার-টাজার করার পর অরু খেতে যেত চাইনিজ রেস্তোরাঁয়। অন্ধকার ঘরে মুখোমুখি খেতে বসা। এইসব খাবার জহিরের মোটেই মুখে রোচে না। স্যুপে কেমন কাঁচা মাংসের গন্ধ। এই জিনিস সবাই এত আগ্রহ করে খায় কী করে ?

অরু খায়, জহির চুপচাপ বসে থাকে।

আজ দু'জনের কেউই খাচ্ছে না। দু'জনই চুপচাপ বসে আছে। স্যুপ মুখে দিয়ে আসমানী বলল, খেতে কেমন যেন ভাতের মাড়ের মতো লাগছে।

কথাটা শুনে জহিরের খুব ভালো লাগল। মেয়েটা বেশ মজার তো।

আসমানী বলল, গুলশান বাজারে যাবেন ? গুলশান বাজারে হয়তো চকলেট কালারের শার্ট পাওয়া যাবে। বিদেশীদের মার্কেট তো। ওখানে সবকিছু পাওয়া যায়। আচ্ছা, আপনি কি কখনো গুলশান মার্কেটে গিয়েছেন ?

না।

আমিও যাই নি। আমি শুধু শুনেছি।

বলতে বলতে অকারণ মনের আনন্দে আসমানী একটু হেসে ফেলল।

কী সুন্দর হাসি! হাসির সময় অনেক মেয়ের চোখ ছোট হয়ে যায়, কিন্তু এই মেয়েটার সবই অদ্ভুত। এর চোখ বড় হয়ে যায়।

আসমানী।

জি।

এই খাবারগুলি খেতে তোমার একটুও ভালো লাগছে না, তাই না ?

হ্যাঁ। আমারও না। চল উঠে পড়ি।

আসমানী বলল, টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে যাক, তারপর আমরা খানিকক্ষণ কফি খেতে খেতে গল্প করব।

কথাগুলি আসমানী খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, যেন সে প্রায়ই এখানে আসে, প্রায়ই খাবার-টাবার শেষ করার পর কফি খায়। গল্প করে।

আসমানী।

জি।

তুমি কি প্রায়ই এখানে আস ?

না তো।

আমি কয়েকবার এখানে এসেছি। অরুর সঙ্গে। ওর আবার এইসব খাবার খুব ভালো লাগে।

জহির লক্ষ করল, আসমানীকে এখন কেমন অন্যমনস্ক লাগছে। জহির বলল, আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি— মানে এমনি জিজ্ঞেস করা, তোমার ইচ্ছা না হলে জবাব দিও না।

আসমানী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনি কী বলতে চান আমি জানি। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়েছে কি-না— এই তো ?

জহির খুবই অবাক হলো। মাথা নিচু করে বলল, হ্যাঁ।

আসমানী বলল, না, কোনোদিন দেখা হয় নি।

জহির বলল, তবে উনার ছবি তোমার কাছে আছে। তাই না?

আসমানী অস্পষ্ট স্বরে বলল, হ্যাঁ, একটা ছবি আছে।

জহির বলল, ঐ ছবিতে উনার গায়ে নিশ্চয়ই চকলেট রঙের একটা শার্ট ছিল।

আসমানী শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল। জহিরের কথার জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছু নেই। কথাটা পুরোপুরি সত্যি। আসমানী ভেবে পেল না বোকা ধরনের এই মানুষটা এটা কী করে বুঝে ফেলল।

জহির বলল, চল যাওয়া যাক। অনেকক্ষণ বসে আছি। ওরা হয়তো ভাবছেন।

আসমানী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, কিছু বলল না। সত্যিসত্যি অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বিকেল হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। আজকের সকালটা খুব সুন্দর ছিল, এখন কেন জানি ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছে। আসমানীর চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। মন খারাপ, মন খরাপ, ভয়ঙ্কর মন খারাপ।

আসমানী বলল, আপনাকে সঙ্গে আসতে হবে না। আপনি থাকুন। আমি একা একাই যাব।

জহির বলল, তুমি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছ?

আসমানী জবাব দিল না। কিন্তু জহির দেখল আসমানীর চোখ ছল ছল করছে।

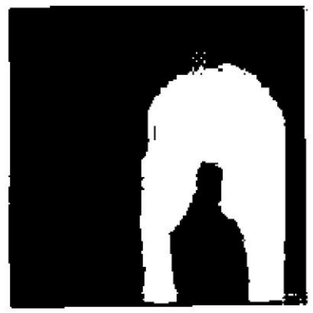

বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে।

লম্বা একজন কেউ এমনভাবে দাঁড়িয়ে যেন সে নিজেকে লুকাতে চাইছে। আগে বারান্দায় সারারাত পঁচিশ ওয়াটের একটা বাতি জ্বলত— এখন জ্বলে না। সুইচে কী যেন গণ্ডগোল হয়েছে।

রাত প্রায় আটটা। দু'টা টিউশনি শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে ন'টার মতো বাজে, ভাগ্যিস আজ একটা বাড়িতে যেতে হয় নি। ছেলেটার গলাব্যথা, গলাব্যথা নিয়ে পড়বে না।

বারান্দায় পা দেয়ার আগেই জহির বলল, কে?

দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা যেন আরো একটু সরে গেল।

কে?

জহির ভাই, আমি তরু।

আরে তরু। তুমি, তুমি এখানে? কতক্ষণ ধরে আছ?

অনেকক্ষণ।

বলো কী? দশটার আগে আসলে তো আমাকে পাওয়ার কথা না। ভাগ্যিস পেয়ে গেলে। আজ একটা ছেলে পড়ল না। ওর গলাব্যথা। তুমি...

কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না জহির ভাই। দরজা খুলুন।

জহির তালা খুলতে খুলতে বলল, অপেক্ষা করার কোনো দরকার ছিল না তরু। যখন দেখলে আমি নেই তখন একটা স্লিপ লিখে চলে গেলেই হতো। তুমি স্লিপ লিখে চলে গেলেই আমি বাসায় চলে যেতাম।

আপনি এত বকবক করছেন কেন জহির ভাই। দরজাটা খুলুন না।

তোমাকে একটা জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি। চাবিটা কোথায় থাকে দেখ। আমার একটা চাবি সঙ্গে থাকে, আরেকটা চাবি জানালা খুলে একটু হাত বাড়ালেই পাবে। যদি কখনো এসে দেখ আমি নেই তখন হাত বাড়িয়ে চাবি

নিয়ে দরজা খুলে ফেলবে। তখন আর কষ্ট করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

উফ, আপনি এত কথা বলা শিখেছেন!

জহির লজ্জিত মুখে বলল, তোমাকে দেখে এত ভালো লাগছে যে শুধু কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

তরু চোখ বড় বড় করে তাকাল। জহির বলল, কেউ তো আমার কাছে আসে না। হঠাৎ যখন কেউ এসে পড়ে এমন ভালো লাগে।

তরু বিছানায় বসতে বসতে বলল, আমি তো জানি অরু আপা মাঝে মাঝে আপনার এখানে আসে। তাই না?

তা আসে, কাজে আসে। এসেই বলে, চললাম। বড় অদ্ভুত মেয়ে।

অদ্ভুত এবং সুন্দর— তাই না জহির ভাই?

হ্যাঁ। সুন্দর তো বটেই। মনটাও ভালো। সুন্দর মেয়েগুলির মন সাধারণত একটু ছোট থাকে, ওর সে-রকম না।

আমি এত রাতে আপনার জন্য কেন বসে আছি তা কি জানেন?

না। তাহলে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?

জহির দেখল তরুর চোখ ভেজা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ হয়তো কাঁদছিল। জহির অভিভূত হয়ে গেল। কাউকে কাঁদতে দেখলে তার বড় খারাপ লাগে। জহির কোমল গলায় বলল, কী হয়েছে তরু?

তরু ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, ইস, ঘরদোর কী করে রেখেছেন। আমি এসে সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। ঘর ভর্তি এত ক্যালেন্ডার কেন? এই জিনিসটাই খারাপ লাগে। এ কী, গত বছরের ক্যালেন্ডারও দেখি আছে।

জহির লজ্জিত গলায় বলল, ফেলা হয় নি। সুন্দর ক্যালেন্ডার, ফেলতে মায়া লাগল।

এত মায়া করলে চলবে না জহির ভাই। খুব প্রিয় জিনিসকেও ছুঁড়ে ফেলার সাহস থাকতে হবে।

তুমি কী জন্যে এসেছ বলো। মামা-মামির শরীর ভালো?

হুঁ।

তাহলে?

অরু আপা আপনার কাছে কবে এসেছিল?

কেন বলো তো?

আপনি আমার কথার জবাব আগে দিন। কবে এসেছিল?

দিন তিনেক আগে।

কেন?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

আহ্, বলেন না।

কিছু টাকার জন্যে।

কত টাকা?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

দরকার আছে জহির ভাই। খুব দরকার। আপা পালিয়ে গেছে।

জহির হতভম্ব হয়ে বলল, তোমার কথা বুঝলাম না। পালিয়ে গেছে মানে?

আজ বিকেলে আজাহার সাহেব এসেছিলেন, তাকে দুলাভাই বলব কি-না বুঝতে পারছি না। উনি বললেন, একটা চিঠি লিখে অরু পালিয়ে গেছে।

কী লেখা চিঠিতে?

আমি কী করে জানব চিঠিতে কী লেখা, চিঠি তো আর সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নি। আমরা জানতেও চাই নি চিঠিতে কী লেখা।

তোমরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনো কথা বললে না?

না। শুধু মা বলল, আপনি আমাদের কাছে এসেছেন কেন? আমরা ওর খবর আগেও রাখতাম না, এখনো রাখি না। তারপর ঐ লোকটা আপনার ঠিকানা চাইল। সেই ঠিকানাও আমরা দিলাম না।

দিলে না কেন?

আমি দিতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু বলার আগেই বাবা বললেন— জহিরের বাসা চিনি, ঠিকানা জানি না। লোকটা তখন আর কিছু না বলে চলে গেল। এরপর থেকেই বাসায় কান্নাকাটি চলছে। খুব খারাপ অবস্থা। এদিকে আবার মীরু...।

মীরু আবার কী করল?

আপনি আমার সঙ্গে একটু বাসায় চলুন তো।

চল যাই।

কে বলে বাসায় কোনো সমস্যা আছে!

সব স্বাভাবিক।

বরকত সাহেব উঠানে বসে পত্রিকা পড়ছেন। জহির এবং তরুকে মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলেন। মনে হচ্ছে খুব জরুরি একটা খবর পড়ছেন। ওদের দিকে তাকিয়ে নষ্ট করার মতো সময়ও তার নেই।

জহির বলল, মামা, ভালো আছেন?

বরকত সাহেব আবার তাকালেন। এবারো জবাব দিলেন না।

এসব কী শুনলাম তরুর কাছ থেকে?

নতুন কিছু শোন নি। নতুন কী শুনলে? অরু পালিয়ে গেছে— এই তো শুনেছ? অরু কি আজ নতুন পালিয়েছে? আগেও তো পালিয়েছে? Its' nothing new. একবার মানুষ যা করে, সেই জিনিসটাই সে বার বার করে। যাও, ভেতরে যাও। Concerned হওয়ার কোনো দরকার নেই। সব ঠিকই আছে।

বরকত সাহেব স্বাভাবিক ভাব দেখাবার চেষ্টা করছেন।

ভেঙে পড়েছেন শাহানা। সেই ভেঙে পড়াটা অরুর কারণে, না মীরুর কারণে— তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অরুর ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু মীরু কী করেছে?

মীরুর ঘরের দরজা বন্ধ। সেই ঘর অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরপর ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছে।

জহির বলল, মামি, মীরুর কী হয়েছে?

শাহানা খড়খড়ে গলায় বললেন, মীরুর তো কিছু হয় নি। মীরুর কথা কে তোমাকে বলেছে?

তরু বলছিল...

তরু কি পৃথিবীর সব জেনে বসে আছে? ওর জিহ্বাটা এত লম্বা কেন? কে তাকে বলেছে রাতদুপুরে তোমাকে ধরে নিয়ে আসতে? তুমি কে? তুমি করবেটা কী?

এত রাগ করছেন কেন মামি?

তোমার বোকামি দেখে রাগ করছি। তোমার মতো বোকা পুরুষমানুষ দেখি নি। আমার কাছ থেকে তুমি যাও তো। তোমাকে দেখলেই রাগ লাগছে।

মামির কথায় জহির রাগ করল না। একটা বড় রকমের সমস্যা যে হয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। সমস্যার সময় কারোর মাথার ঠিক থাকে না। মেয়েরা নার্ভাস হয়ে অকারণ রাগারাগি করে।

জহির রাত দশটা পর্যন্ত থেকেও বিশেষ কিছু জানতে পারল না। বরকত সাহেব পত্রিকার পাতা চোখের সামনে মেলে আগের মতোই বসে রইলেন। জহির যখন বলল, মামা, আমি কি থাকব, না চলে যাব? বরকত সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, তোমার এখানে থাকার দরকারটা কী? তরু যে তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছে তাতেই আমি রাগ করেছি। আমার সব কটা মেয়ে গাধা— শুধু গাধা না, গাধার গাধা।

তরু পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বরকত সাহেব তাকেও প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন। সেই ধমকের বিষয়বস্তু হলো— গাধার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে জানালা বন্ধ করে রাখলে মশা ঘরে কম ঢোকে।

জহির চলে গেল।

জহির দু'বার কলিং বেল টিপল।

মনে হয় আজাহার সাহেব জহিরের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দরজা খোলার আগেই বললেন, আসুন জহির সাহেব, আসুন। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম আপনি আসবেন। আমার ধারণা ছিল আরো পরে আসবেন। রাত বারটা একটার দিকে। আগেই এসে পড়েছেন। কেমন আছেন জহির সাহেব?

জি ভালো।

বসুন। এই বিছানায় আরাম করে পা তুলে বসুন। আপনাকে অনেকক্ষণ থাকতে হবে। কথা আছে।

বলুন কী কথা।

বলব। সবই বলব, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ভাই? চা খান। দোকান থেকে ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছি। চা খাব আর গল্প করব।

আগে ব্যাপারটি কী বলুন।

ব্যাপার কিছুই নেই। ব্যাপার খুব সিম্পল— অরু চলে গেছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় লিপস্টিক দিয়ে লিখেছে—

যেভাবে এসেছিলাম
সেভাবে চলে গেলাম
চারদিকে লিলুয়া বাতাস।

কাবা করার একটা প্রচেষ্টা। ফাজলামি আর কী ? লিলুয়া বাতাস কী, জানেন ?

না।

ডিকশনারিতে পাবেন না। লিলুয়া বাতাস মানে হচ্ছে— যে বাতাস মানুষ নিয়ে খেলা করে, মানুষকে উদাস করে, বিষণ্ণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় আছে। আমিই শিখিয়েছিলাম।

ও চলে গেল কেন ?

জানি না ভাই। সত্যি জানি না। উদ্ভট উদ্ভট কথা সে আমার সম্পর্কে অনেককে বলে— যেমন আমি এখানে তাসের আড্ডা বসাই, মদের আড্ডা বসাই, আজেবাজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফূর্তি করি। একটা কথাও ঠিক না। কেন সে এসব বলে তাও বুঝি না। আমি একজন শিক্ষক মানুষ। আজেবাজে সব কাণ্ড কারখানা ইচ্ছা থাকলেও আমি করতে পারব না।

আমি জানি সে আমার জন্যে অনেক কিছু ছেড়েছে। আমিও কি তার জন্যে অনেক কিছু ছাড়ি নি ? আমি কি তার জন্যে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব ছাড়ি নি ? আপনি কি জানেন যে আমার চাকরি চলে গেছে। বেসরকারি কলেজের চাকরি। আমার স্ত্রী কলেজ গভর্নিং বডিকে ভয়ংকর সব কথাবার্তা বলেছে। শুধু তাই না, তার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়া, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ঐ মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজি করিয়েছে— ঐ মেয়ে লিখিত একটা অভিযোগ করেছে আমার সম্পর্কে। সেই অভিযোগ কি শুনতে চান ? অভিযোগ হচ্ছে— একদিন বিকেলে এই মেয়ে আমার কাছে পড়া বুঝতে এসেছিল, তখন নাকি আমি তার শাড়ি খুলে ফেলার চেষ্টা করেছি।

শিক্ষকতা আমার পছন্দ। আমি পড়াতে পছন্দ করি। কিন্তু আজ আমার সব গেছে। ঘরে বসে থাকি। কেরুর জীন কিনে নিয়ে আসি আর চুক চুক করে খাই।

জহির বলল, আপনি তো একটু আগে বললেন খান না। এইসব রটনা।

না, পুরোপুরি রটনা না। ট্রুথ কিছু আছে। সব সত্যির সঙ্গে যেমন মিথ্যা মেশানো থাকে, তেমনি সব মিথ্যার সঙ্গেও সত্যি মেশানো থাকে। আপনি বসুন। আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।

কী দেখাবেন ?

বললাম তো একটা মজার জিনিস। ইন্টারেস্টিং।

জহির বসে আছে। তার বসে থাকতে ভালো লাগছে না, আবার উঠে চলে যেতেও ইচ্ছে করছে না। আজাহার নামের এই মানুষটির সবাইকে মুগ্ধ করে রাখার একটা ক্ষমতা আছে।

জহির সাহেব ?

জি।

দেখুন তাকিয়ে, এর নাম কী বলুন ?

জহির তাকিয়ে দেখল, জিনিসটির বিশেষ কোনো নাম মনে পড়ল না। বাঁকানো ধরনের একটা ছোরা। ছোরার হাতলে নানান ধরনের কারুকার্য। নীল, হলুদ কিছু পাথর বসানো।

আজাহার সাহেব শান্ত গলায় বললেন, রাজপুত রমণীদের কাছে এই জিনিস থাকে। ওরা কোমরে গুঁজে রাখে। অরুও এটি জোগাড় করল এবং ঘোষণা করল, এটা সে কিনেছে একটা খুন করবার জন্যে। আমাকে সে খুন করবে। এখন বলুন, আপনাকে আপনার স্ত্রী এই কথা বললে আপনার শুনতে কেমন লাগত ?-

জহির বলল, অরু খুব রসিকতা করে।

আপনার সঙ্গে সে কি কখনো রসিকতা করেছে ?

না।

তাহলে আমার সঙ্গে তার এত কিসের রসিকতা ? আমি কি তাকে পা ধরে সেধেছিলাম, এসো তুমি আমাকে বিয়ে করে উদ্ধার কর ? না, কখনো না। সে সায়েন্সের মেয়ে, আমি পড়াই ইতিহাস। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে কী মনে করে সে আমার একটা ক্লাস করতে এলো...। গল্পটা কি আপনি শুনতে চান ?

বলুন।

আমি পড়াচ্ছিলাম সম্রাট অশোক এবং সম্রাট প্রিয়দর্শিনী। দু'জন কি আসলে এক, না ভিন্ন ? কে সম্রাট অশোক, কে প্রিয়দর্শিনী ? আমি ক্লাসে নানান ধরনের ড্রামা করতে পছন্দ করি। কিছু প্রাচীন ভারতীয় ভাষা জানি, গম্ভীর গলায় সেসব বলে একটা পুরনো আবহাওয়া তৈরি করি। এইসব দেখে এই মেয়ে অন্যরকম হয়ে গেল। অল্পবয়েসী মেয়েদের মনে যখন প্রেম আসে তখন তা আসে টাইডাল ওয়েভের মতো। অরু নিজে তো ভেসে গেলই, আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই আমি একজন বুড়ো মানুষ। ওল্ড ম্যান। 13th Nov 1940-এ আমার জন্ম। আমার বয়স হিসেব করে দেখুন। এই মেয়ে তার নিজের যতটুকু না সর্বনাশ

করল, আমার করল তারচে' বেশি। এখন সে বলে বেড়াচ্ছে অবিশ্বাস্য সব কথা।

আমার এক বন্ধু না-কি রান্নাঘরে গিয়ে তার নাভিতে হাত দিয়েছে। আমার ঐ বন্ধুটি চারিত্রিক দিক থেকে মহাপুরুষ ধরনের। সে মাঝে মাঝে আমার এখানে এসে তাস খেলত। তার পক্ষে...

আজাহার সাহেব আপনি বলেছিলেন এখানে তাস খেলা হয় না।

বলেছিলাম ?

হ্যাঁ, শুরুতে বলেছিলেন।

মাঝে মাঝে তাস খেলা হয়। Once in a full-moon. এই বাড়ি তো আর মসজিদ বা মন্দির না যে এখানে তাস খেলা যাবে না।

আপনি তাহলে পুরোপুরি সত্যি কথা বলছেন না।

আরো ভাই কী মুস্কিল, পুরোপুরি সত্যি কথা তো কেউ বলে না। কেন বলবে ? মানুষ তো আর কম্পিউটার না যে পুরোপুরি সত্যি কথা বলবে। একমাত্র কম্পিউটার পুরোপুরি সত্যি কথা বলে। এই জন্যেই কম্পিউটারের প্রেমে পড়া যায় না। মানুষের প্রেমে পড়া যায়।

ভাই, আমি উঠি।

উঠতে চান ?

হ্যাঁ।

যে-সব কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম তার একটি কথাও আপনাকে এখনো বলা হয় নি।

বলুন।

নাম্বার ওয়ান, আমার ধারণা অরু জীবিত নেই। চমকে উঠবেন না। চমকে ওঠার মতো কিছু না। আমার আরো একজন স্ত্রী আছে, সে অরুকে হত্যা করার জন্যে লোক লাগিয়েছে এই গুজব বাজারে আছে। নাম্বার টু, মেয়েটা অসুস্থ। সে নিজেও আত্মহত্যা করতে পারে। নাম্বার থ্রি, সে অসম্ভব সুন্দরী মেয়ে, গুণ্ডা-পাণ্ডাদের হাত পড়লেও একই জিনিস হবে। গ্যাং রেপ বলে একটি কথা আছে। আপনি শুনেছেন কি-না জানি না। আপনাকে যে-রকম সুফি মানুষ বলে মনে হয়, আপনার না শোনারই কথা। গ্যাং রেপ বিষয়টি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন পাঁচজন যুবক এবং একজন তরুণী আছে। যুবকরা সবাই লাইন ধরে অপেক্ষা করছে...

জহির বলল, দয়া করে চুপ করুন, আপনি ক্রমাগত আজেবাজে কথা বলছেন। কেন বলছেন ?

বলছি, কারণ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েটা মারা গেলে আমি বিরাট বিপদে পড়ে যাব। পুলিশ কোনো না কোনো সূত্র বের করে আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। বিজ্ঞ জজ সাহেব দড়িতে ঝুলিয়ে দেবেন। জজ সাহেবরা নিজেরা যেহেতু কখনো দড়িতে ঝুলেন না, তারা জানেন না ব্যাপারটা কী ? কাজেই I am going to die.

আজাহার সাহেব!

জি।

আপনি কি মদ্যপান করেছেন ?

বেশি করতে পারি নি, অল্প করেছি। এত পয়সা আমার কেথায় ভাই ? আপনাকে আমি এখন একটা রিকোয়েস্ট করব। যদি চান আপনার পায়ে ধরেই রিকোয়েস্ট করব। সেটা হচ্ছে— আমি জানি অরু যদি বেঁচে থাকে তাহলে সে আপনার সঙ্গে দেখা করবেই। আপনি তখন দয়া করে আমাকে সেটা জানাবেন।

আমার সঙ্গে দেখা করবে কেন ?

কারণ আপনাকে সে ভালোবাসে। আপনি একটা মহা গাধা বলে এই সহজ জিনিসটা ধরতে পারেন নি। শুধু যে সে-ই আপনাকে ভালোবাসে তাই না, অরুর ছোট বোন তরু... ঐ মেয়েটিও আপনার জন্যে পাগল। এই তথ্যটাও আপনার জানা নেই। আপনি তো ভাই বিশ্বপ্রেমিক।

জহির চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। আজাহার সাহেব বললেন— বোকামি ছাড়া আপনার মধ্যে এমন কিছু নেই যা চোখে পড়ে। এই বোকামির জন্যেও যে মেয়েরা প্রেমে পড়তে পারে তা আমার জানা ছিল না। আপনি যদি এখন চলে যেতে চান, চলে যেতে পারেন। বোকা মানুষদের আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

A rich man you can tolerate many times
A wise man can only twice be tolerated
But a fool...

বাকিটা শেষ করলাম না। শেষ করলে মনে কষ্ট পাবেন। আসুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

এগিয়ে দিতে হবে না।

হবে রে ভাই, হবে। এগিয়ে দিতে হবে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ছাতা নিয়ে এই জন্যেই যাচ্ছি। বাসে তুলে দিয়ে আসব। এতটুকু গুণ আমার আছে। তা ছাড়া জানেন না বোধহয় যে, মাতালদের ভদ্রতাবোধ হয় অসাধারণ।

আপনি মাতাল হন নি।

হয়েছি। মাতাল হয়েছি। ভালোমতোই হয়েছে। মদ না খেয়েও মানুষ মাতাল হতে পারে। একটা ভালো কবিতা পড়ে মাতাল হতে পারে, একটা সুন্দর সুর শুনে মাতাল হতে পারে, প্রেমে পড়েও মাতাল হতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আজাহার সাহেব বললেন, মাতালদের ফেভারে কিছু চমৎকার কথা আছে আপনাকে বলছি, শুনুন। অরুকে বলায় অরু খুব মজা পেয়েছিল— আপনিও পাবেন। আপনি তো অরুর বন্ধু— বলব?

বলুন।

একজন মাতাল অতি সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে।

একজন ঘুমন্ত মানুষ কোনো পাপ করতে পারে না।

যে পাপ করতে পারে না সে স্বর্গে যায়।

কাজেই মাতালরা সব সময় স্বর্গে যায়।

মজার কবিতা না?

জহির জবাব দিল না।

রাস্তায় প্রচণ্ড বৃষ্টি। আজাহার সাহেব নিজে ভিজতে ভিজতে অনেক ঝামেলা করে জহিরকে একটা রিকশা ঠিক করে দিলেন। রিকশায় উঠবার ঠিক আগ মুহূর্তে বললেন, আপনাকে অনেক মন্দ কথা বলেছি, দয়া করে মনে কিছু করবেন না। আপনার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি— অরুর ব্যক্তিগত একটা খাতা, ডায়েরিও বলতে পারেন। আমার সম্পর্কে এই খাতায় সে অনেককিছু লিখেছে। পাশাপাশি আপনার কথাও লিখেছে। পড়লে আপনার ভালো লাগবে।

তাই নাকি?

জি। অরু ফিরে না এলে আমি পাগল হয়ে যাব জহির সাহেব।

আজাহার সাহেব রিকশাওয়ালা এবং আশপাশের দুএকজন মানুষকে সচকিত করে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। মাতালের কান্না নয়, জগত

সংসার ছারখার হয়ে যাওয়া একজন মানুষের কান্না। রিকশাওয়ালা পর্যন্ত অভিভূত হয়ে বলল, ভাইজান, কাইন্দেন না— আল্লারে ডাকেন। আল্লা ছাড়া আমরার আর কে আছে?

সুন্দর ডায়েরিতে মেয়েরা খুব যত্ন করে অনেককিছু লেখে। এই লেখা মোটেই সে-রকম নয়। মোটা লাইন টানা খাতা। শুরুতে বায়োলজির নোট নেবার জন্যে হয়তো কেনা হয়েছিল। বায়োলজির নানান প্রসঙ্গে খাতা ভর্তি। তার ফাঁকে ফাঁকে অন্যসব কথা। হয়তো ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে দীর্ঘ একটা লেখার ফাঁকে চার লাইনের সম্পূর্ণ অন্য একটা লেখা।

জহির সারারাত জেগে লেখাগুলি পড়ল—

জহির ভাইকে নিয়ে আজ মা'র সঙ্গে ঝগড়া হলো।

ঝগড়া হবার মতো কোনো ঘটনা ছিল না, তবু হলো। আসলে অন্য একটা ব্যাপারে আমি মা'র উপর রেগেছিলাম। সুযোগ পেয়ে রাগ ঝাড়লাম। মা খুব অবাক হলেন— আমি জহির ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে এত কথা বলছি কেন? মাঝখান থেকে বেচারা জহির ভাই খুব লজ্জা পেলেন। আমার মনে হচ্ছে বেচারা আর অনেকদিন আমাদের বাসায় আসবেন না। এরকম ছোটখাট একটা ঘটনা ঘটে আর জহির ভাই সপ্তাহখানেক এ বাসায় আসা ছেড়ে দেন।

আজকের সমস্যার সূত্রপাত হলো এইভাবে— জহির ভাইকে বাজারে পাঠানো হয়েছিল, তিনি বাইম মাছ নিয়ে এসেছেন। সেই বাইম মাছ দেখে মা তার স্বভাবমতো অগ্ন্যুৎপাত শুরু করলেন— সাপের মতো দেখতে একটা মাছ তুমি কী মনে করে আনলে? কে খাবে এই মাছ?

আমি তখন বললাম, ওমা, বাইম মাছ! আমার খুব ফেভারিট মাছ।

জহির ভাই আনন্দিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টি দেখে আমার বড় ভালো লাগল। আহা বেচারা।

মা হতভম্ব। তিনি বললেন, বাইম মাছ তোর পছন্দ? তুই কবে খেয়েছিস?

আমি কখনো খাই নি, তবু বুঝতে পারছি এ মাছ খেতে অসাধারণ হবে।

জহির ভাই বিব্রত গলায় বললেন, আমি বদলে নিয়ে আসছি।

আমি বললাম, অসম্ভব। আমি আজ বাইম মাছ ছাড়া অন্য কোনো মাছ খাবই না।

তরু জহির ভাইয়ের সঙ্গে কী যেন কথা বলছিল। ওরা বারান্দায় বসে কথা বলছিল। অবাক হয়ে দেখি তরুর গাল লাল, মাথা নিচু হয়ে আছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়েই তরু থেমে গেল এবং চোখ-মুখ কেমন করে যেন তাকাল। তাকানোর এই দৃষ্টি আমি চিনি। আমি কেন, সবাই চেনে। শুধু গাধার গাধা জহির ভাই চেনেন না। কোনোদিন চিনবেনও না।

আমি তরুকে ডেকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। বললাম, জহির ভাইয়ের সঙ্গে কী কথা বলছিলি ?

কোনো কথা বলছিলাম না তো।

কোনো কথা বলছিলি না ?

ক্লাসের একটা মেয়ের কথা বলছিলাম।

কী কথা ?

মেয়েটার নাম তৃষ্ণা, ও একটা ছেলের প্রেমে পড়েছে। ছেলেটা ওদের আত্মীয়— ঐ গল্পটা বলছিলাম।

কেন ?

কথায় কথায় চলে আসল— ওর কথা তোমাকেও তো বলেছি।

আমি হঠাৎ তরুর গালে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলাম। এই কাজটা আমি কেন করলাম তরু কি তা বুঝতে পারল ? অবশ্যই পারল। আমি যেমন মেয়ে, তরুও তো তেমনি মেয়ে। ও কেন পারবে না ? ওকে চড়টা দিয়েই আমি দুহাতে

নিজের মুখ ঢেকে কাঁদলাম। তরু আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতে লাগল। আহারে, এত ভালো কেন আমার বোনটা!

জহির ভাইকে আমার এত ভালো লাগে কেন তা বুঝতে চেষ্টা করছি। কারণ নেই। কোনো কারণ নেই। এই মানুষটা একটা অকাট গাধা, একটা ছাগল। একবারের কথা— বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে ঢাকায় ফিরছি। আমি বললাম, জহির ভাই, আসুন আমরা ডেকের বেঞ্চিতে বসে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে যাই। গাধাটা বলল, ঠাণ্ডা লাগবে তো। আমি বললাম, লাগুক। আমি একা একা বসে আছি, গাধাটা কোত্থেকে একটা কম্বল না কী যেন এনে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। যখন কম্বলটা জড়িয়ে দিচ্ছে তখন হঠাৎ কেন জানি আমার চোখে পানি এসে গেল। এর নামই কি ভালোবাসা ? এই ভালোবাসা কোথায় লুকিয়ে থাকে ? কোন অচেনা জগতে ? কোন অচেনা ভুবনে ? কী করে সে আসে ? কেন সে আসে ? কেন সে আমাদের অভিভূত করে ?

জহির ভাই আমার পাশে বসলেন। জড়সড় হয়ে বসলেন। একটু সরে বসলেন, যেন গায়ের সঙ্গে গা লেগে না যায়। আমি বললাম, এমন দূরে সরে বসেছেন কেন ? আপনার কি ধারণা আমার গা'র সঙ্গে গা লাগলে আপনার পাপ হবে ?

জহির ভাই বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

আমি বললাম, আসুন তো, আপনি আমার আরো কাছে সরে আসুন।

তিনি কাছে এলেন, আমি মনে মনে বললাম, জনম জনম তব তরে কাঁদিব।

কী আশ্চর্য! কেন কাঁদব ? কী আছে এই মানুষটির ? হে ঈশ্বর, ভালোবাসা কী আমাকে বুঝিয়ে দাও।

রাত কত হবে ?

দুটা ? তিনটা ? না তার চেয়েও বেশি। আমি দরজা খুলে বের হলাম। আকাশ ভেঙে জোছনা নেমেছে। কী জোছনা! জোছনায় মন এমন করে কেন ? অনেকক্ষণ বসে রইলাম বারান্দায়। আমার মাথাটা হঠাৎ গণ্ডগোল হয়ে গেল। আমি বসার ঘরে ঢুকলাম। ওখানে একটা খাটে জহির ভাই ক'দিন ধরে আছেন। আমি ঘরে ঢুকলাম খুব সাবধানে। আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। কী করছি বুঝতে পারছি না। জহির ভাইয়ের খাটের পাশে বসলাম। আমার ধারণা ছিল তিনি ঘুমোচ্ছেন। আসলে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন না। আমি পাশে বসামাত্র জহির ভাই বললেন, অরু, তুমি ঘুমাতে যাও। আমি একটা কথা না বলে উঠে চলে এলাম। এর পরে কতবার দেখা হলো, আমরা দু'জনে এমন ভাব করলাম যেন এমন একটি ঘটনা কোনোদিন ঘটে নি। কিংবা কে জানে হয়তো সত্যি এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। হয়তো এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য।

করিম সাহেব জহিরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বেয়ারা দিয়ে স্লিপ পাঠিয়েছেন— তুমি দেখা কর। জরুরি।

জহির স্লিপ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারল না। তাকে যেতে হলো সেজো সাহেবের কাছে। এই অফিসের তিন সাহেব— বড়, মেজো এবং সেজো। সবচে' মেজাজি সাহেব হচ্ছেন সেজো জন। অদ্ভুত কোনো কারণে তার ক্ষমতাও মনে হয় খুব বেশি। যদিও মানুষটা মিষ্টভাষী। কখনো রাগেন না। অফিসের যে কোনো কর্মচারী তার ঘরে ঢোকামাত্র হাসিমুখে বলেন, আগে বসুন তো দেখি কেমন আছেন ?

কর্মচারী হাত কচলে বলে, জি স্যার, আপনার দোয়া।

আপনাকে আজ এমন রোগা রোগা লাগছে কেন ? বাড়িতে অসুখ-বিসুখ ?

কর্মচারী আরো বিগলিত হয়ে বলে, জি-না স্যার। জি-না। সব ঠিক আছে স্যার।

সব যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার সামনে হাসিমুখে বসুন। দুএকটা হাসি তামসার কথা বলুন। চা চলবে ?

সকলেই জানে এইসব আলগা খাতিরের কথার আসলে কোনো মানে নেই। পুরাটাই এক ধরনের ভড়ং, এক ধরনের ভান। তবুও কেন জানি ভড়ংটাই ভালো লাগে। ভানটাকেই সত্যি ভাবতে ইচ্ছা করে।

জহির ভয়ে ভয়ে বলল, স্যার আসব ?

আসুন, জহির সাহেব, বসুন, খবরাখবর কী বলুন। আপনাকে রোগা রোগা লাগছে কেন ? কানের কাছে কয়েক গাছি পাকা চুল দেখতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা কী বলুন তো ? আপনার মতো ইয়ং ম্যানরা যদি চুল পাকিয়ে ফেলেন তাহলে সংসার চলবে কীভাবে ? চা চলবে ?

জহির এই দীর্ঘ প্রস্তাবনার কিছুই বুঝতে পারল না।

সেজো সাহেব বিনা কারণে গল্প করে সময় নষ্ট করার মানুষ নন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যটাও জহির ধরতে পারছে না। কাজকর্ম কেমন চলছে সেটা জিজ্ঞেস করলেন, এই চাকরি কীভাবে পাওয়া গেল তাও জানতে চাইলেন। আমাদের দেশের অবস্থা দশ বছর পর কী হবে তাও বললেন। জহির হ্যাঁ হুঁ ছাড়া কিছুই বলল না। সে কী বলবে ?

চা শেষ হবার পর সেজো সাহেব বললেন, আচ্ছা যান।

জহির ক্ষীণ স্বরে বলল, কী জন্যে ডেকেছিলেন স্যার ?

এমনি ডাকলাম। গল্প করার জন্যে ডাকা। আমরা এক অফিসে কাজ করি, কেউ বড় কাজ করি, কেউ ছোট। তাতে তো কিছু যায় আসে না। সম্পর্ক তো রাখতেই হবে। আমেরিকায় আমি দেখেছি অফিসের বস এক টেবিলে বসে জেনিটারের সঙ্গে চা খাচ্ছে। Can you imagine ? একজন জেনিটার, যার কাজ হচ্ছে বাথরুম পরিষ্কার করা। আচ্ছা জহির সাহেব যান। পরে দেখা হবে।

জহির পুরোপুরি হতচকিত অবস্থায় বের হয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। করিম সাহেব কী একটা ফাইলের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। তিনি ফাইল বন্ধ করে বললেন, চল আমার সঙ্গে। প্রথম গেলেন ক্যান্টিনে। ঢুকতে গিয়েও ঢুকলেন না। বললেন, এখানে ভিড় বড্ড বেশি, চল বাহিরে কোথাও যাই।

ব্যাপার কী স্যার ?

করিম সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, ব্যাপার কী তুমি কিছুই জানো না ?

জি-না।

গতকাল অফিসে আস নাই ?

জি-না। আমার এক মামাতো বোন— স্যার, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। অরু তার নাম। আপনি বোধহয় দেখেছেন, কয়েকবার অফিসে এসেছে।

এখন কি তুমি সেজো সাহেবের কাছে গিয়েছিলে ?

জি।

সেজো সাহেব তোমাকে কিছু বলেছেন ?

জি-না।

করিম সাহেব জহিরকে নিয়ে কোনো চায়ের দোকানে ঢুকলেন না। অফিস থেকে রোস্তোরাঁয় বের হয়ে শুকনো গলায় বললেন, তোমার যে চাকরি নিয়ে

সমস্যা হচ্ছে তুমি কিছু শুনেছ ?

জহির তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। চাকরি নিয়ে সমস্যা হবে কেন ? সমস্যা হবার কী আছে ?

করিম সাহেব বললেন, আমি ব্যাপারটা জানলাম কাল বিকাল তিনটায়। বড় সাহেব ছিলেন না। সেজোর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন— চাকরির কন্ডিশনই ছিল— টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ছাঁটাই হলে অসুবিধা নেই।

জহির হতভম্ব হয়ে বলল, গত বছর তো স্যার পার্মানেন্ট হয়েছে।

আমিও সেই কথাই বললাম। তিনি ফাইল বের করে দেখালেন যে চাকরি এখনো টেম্পোরারি।

ছাঁটাই কি হয়ে গেছে স্যার ?

না, এখনো হয় নি।

জহির তাকিয়ে আছে।

করিম সাহেব ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

জহির ?

জি স্যার।

আমি কাল রাতে তোমার বাসায় গিয়েছিলাম, অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। তুমি ছিলে না।

বাসায় ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল।

জহির ?

জি স্যার।

তোমাকে আমি কী রকম পছন্দ করি তা কি তুমি জানো ?

জানি স্যার।

না, জানো না— কারণ আমি নিজেও জানতাম না। কাল সারারাত আমি ঘুমাই নি, বারান্দায় বসে ছিলাম।

বলতে বলতে করিম সাহেবের গলা ধরে এলো। আসলেই এই ছেলেটির প্রতি তাঁর মমতার পরিমাণ তিনি এর আগে কখনো বুঝতে পারেন নি। যে ছেলের দুদিন পর বিয়ে, আজ তার চাকরির সমস্যা— এই ব্যাপারটা তাঁকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। কেন এমন হবে ?

জহির ?

জি স্যার।

তোমার বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক আছে তো ?

জি স্যার, এখনো আছে।

ঠিক রাখবে। মেয়েপক্ষীয়দের কিছুই জানানোর দরকার নেই। তুমি ভয় পেয়ো না। মানুষের ভাগ্য মানুষের কাছে না, আল্লাহর কাছে। একটা কিছু হবেই।

জহির চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

করিম সাহেব বললেন, হঠাৎ করে তোমার চাকরি নিয়ে সমস্যাটা কেন হলো তা বুঝতে পারছি না। ইউনিয়নের লিডার মকবুলকে বললাম, মকবুল বলল— দেখবে। কিন্তু তার কথার মধ্যে কোনো জোর নেই। দেখলে তো এখনই দেখতে হবে। চাকরি চলে গেলে দেখার কী থাকবে ? মকবুলটা একটা হারামজাদা।

অর্ডার কি স্যার হয়ে গেছে ?

না, তবে হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সেজো সাহেবের কোনো রিলেটিভ ঢুকবে। একটা ছেলের নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও ইস্যু হয়েছে।

আমি এখন কী করি স্যার ?

করিম সাহেব কিছু বললেন না। মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছে।

স্যার, আমি কি বাসায় চলে যাব, না অফিসে কাজ করব ?

বাসায় যাবে কেন ? বাসায় যাবার কী আছে ? অফিসেই থাক। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।

আশ্চর্যের ব্যাপার! এত ভয়াবহ একটা খবর, অথচ জহির কাউকেই তা দিতে পারল না।

বরকত সাহেবের বাসায় গেল। শাহানা তার সঙ্গে একটি কথা বললেন না। তরু এবং মীরু দুজনের কেউই বাসায় নেই। ওরা কোথায় জিজ্ঞেস করায় শাহানা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমি কি রেলের টাইমটেবিল ? কে কোথায় গেছে হিসাব রাখব ?

বরকত সাহেবও কোনো কথা বললেন না। শুধু দুবার বললেন তার শরীরটা ভালো না, মাথাব্যথা।

এটা আসলে প্রকারান্তরে বলে দেয়া— তুমি এখন যাও।

জহির বলল, অরুর কি কোনো খবর পাওয়া গেছে মামা ?

না। খবর নিয়ে ভাবছিও না। No news is good news. আচ্ছা জহির, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল তোমার বিয়ে উপলক্ষে ভালো কিছু দেয়া— এক জোড়া কানের দুল কেনা হয়েছে। তুমি মেয়েকে যে গয়না পাঠাবে তার সাথে দিয়ে দিও। দুল জোড়া তরুর কাছে আছে। ঐ নিয়ে আরেকদিন আলাপ করব। আজ যাও। শরীরটা ভালো না, মাথা ধরেছে।

জহির উঠে পড়ল। তার ভাগ্যটা অদ্ভুত। খুব কষ্টের সময় সে আশেপাশে কাউকে পায় না, যাকে কষ্টের কথা বলা যায়। সে এখন যদি আসমানীর কাছে চলে যায় তাহলে কেমন হয় ? সে কি আসমানীকে বলতে পারে না— আসমানী, আজ আমার খুব কষ্টের দিন। আজ আমার চাকরি চলে গেছে।

না-কি সে সেজো সাহেবের বাড়িতে যাবে ? সেজো সাহেবের স্ত্রীকে বলবে, ম্যাডাম, সাতদিন পর আমার বিয়ে অথচ...।

কোনো পীর সাহেবের কাছে গিয়ে দোয়া চাওয়া যায় না ? তাঁদের কত রকম ক্ষমতার কথা শোনা যায়। সত্যি সত্যি হয়তো তাঁদের ক্ষমতা আছেও। সবাই সেইসব ক্ষমতার খবর রাখে না।

জহির কোথাও গেল না।

কলাবাগানে বাচ্চাদের পার্কের একটা বেঞ্চিতে অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল। ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। আজ অসম্ভব গরম পড়েছে। তার বুক কাঁপছে। সে খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না। এরকম হচ্ছে কেন ? কেন এরকম হচ্ছে ?

বার বার সুশীতল একটা নদীর ছবি শুধু মনে আসছে। যে নদীতে গা ডুবিয়ে শুয়ে থাকা যায়। যে নদীর জলের টান খুব প্রবল, প্রবল টানে শুধু দক্ষিণের দিকে ভেসে ভেসে যাওয়া। দক্ষিণে সমুদ্র। তারও দক্ষিণে কী ?

আকাশ মেঘলা।

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে।

জহির এক সময় উঠল।

জহিরের ঘরের দরজা খোলা।

বাতি জ্বলছে। জহির বারান্দায় থমকে দাঁড়াল। ভেতর থেকে গুনগুন করে গান শোনা যাচ্ছে—

জনম জনম তব তরে কাঁদিব।
যতই ভাঙিবে খেলা
ততই সাধিব।
তোমারই নাম গাহি
তোমারই প্রেম চাহি
ফিরে ফিরে নিতি তব চরণে আসিব।

খুব কষ্টের একটা গান। কিন্তু গাওয়া হচ্ছে হাসি তামাশা করে, যেন এটা মূল গানের একটা প্যারোডি, যেন কোনো একটা হাসির গান।

জহির ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কখন এসেছ অরু?

অরু বলল, অনেকক্ষণ। আপনার চাবি খুঁজে পাই নি বলে তালা ভেঙেছি। সরি ফর দ্যাট। তবে আপনার অনেক কাজ করে রেখেছি। রান্না করেছি। আসুন, দুজনে খেতে বসে যাই। নাকি গোসল করবেন? যদি গোসল করতে চান গরম পানি করে দিতে পারি। বলতে বলতে অরু মিষ্টি করে হাসল।

জহির কিছুই বলতে পারছে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। অরু বলল, আপনি এত অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি নিশ্চয়ই জানতেন, আমি একদিন আসব। জানতেন না?

জানতাম।

অরুকে কেমন রোগা রোগা লাগছে। তার চোখের নিচে কালি। গাল ঈষৎ লালচে। সম্ভবত গায়ে হাত দিলে উত্তাপ টের পাওয়া যাবে।

জহির ভাই?

বলো।

আপনার মনে যদি কোনো কঠিন প্রশ্ন থাকে তার উত্তর খেতে খেতে দেয়া যাবে। আরেকটা কথা, আপনাকে এমন লাগছে কেন? ভয়ঙ্কর কিছু কি ঘটেছে?

না।

তাহলে মুখ এমন গোমড়া করে রাখবেন না। আজাহারের প্রেমে পড়েছিলাম কেন জানেন? ঐ লোকটা মুখ গোমড়া করতে পারত না। ভয়ঙ্কর কঠিন সময়েও

হেসে ফেলত। আর এমন সুন্দর করে হাসত যে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করত— ফিরে ফিরে নিতি তব চরণে আসিব।

জহির অবাক হয়ে লক্ষ করল, অরুর চোখে পানি এসে গেছে, সে চোখ মুছছে।

অরু বলল, এত অল্প সময়ে বেশি কিছু রাঁধতে পারি নি। একটা পচা বেগুন ছিল, ভর্তা করে ফেলেছি। পচা বেগুনের ভর্তা খুবই ভালো জিনিস। ডাল রান্না হয়েছে। আমার ধারণা ডালের মধ্যে তেলাপোকা ডিম পেড়েছিল। কেমন তেলাপোকা তেলাপোকা গন্ধ। আপনার স্ত্রী আসমানী এসে সব ঠিক করবে।

জহির বলল, এতদিন কোথায় ছিলে?

মাই গড, একেবারে জীবনানন্দ দাশ— এতদিন কোথায় ছিলে? হাসপাতালে ছিলাম। এমআর করিয়েছি। এমআর কী, জানেন?

না।

পেটে যদি আনওয়ান্টেড কোনো শিশু চলে আসে, তাহলে আধুনিক ডাক্তারি শাস্ত্র মা'কে কোনোরকম কষ্ট না দিয়ে শিশুটিকে মেরে ফেলতে পারে। শিশুটি হয়তো কষ্ট পায়, কিন্তু সে তার কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না বলে আমরা তা জানি না। জহির ভাই, আপনি এমন ঘৃণা ঘৃণা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? আপনার কি মনে হচ্ছে আমি একজন খুনী?

না।

আমি জানি হচ্ছে। আপনার চোখ দেখে বুঝতে পারছি। আপনার কোনো দোষ নেই। আমারও নিজেকে খুনী মনে হয়। সারাক্ষণ মনে হয় ঐ শিশুটা দূর থেকে আমাকে দেখছে। আমার কী ধারণা, জানেন? আমার ধারণা ঐ শিশুটা একটা মেয়ে। আমি ওর নাম দিয়েছি রাত্রি, যদিও তার এখন আর নামের কোনো দরকার নেই। রাত্রি নামটা কী সুন্দর, না জহির ভাই?

হ্যাঁ সুন্দর। খুব সুন্দর।

আপনার যদি কোনোদিন মেয়ে হয়, আপনি ওর নাম রাখবেন রাত্রি।

আচ্ছা রাখব।

প্রমিজ করুন।

করছি।

না, এভাবে করলে হবে না, আমার হাত ধরে করুন।

জহির অরুর হাত ধরল, নরম গলায় বলল, যে কাজটা করে তুমি এত কষ্ট পেলে সে কাজটা কেন করলে ?

রাগ করে করলাম জহির ভাই। প্রচণ্ড রাগ হলো। সবার উপর রাগ। ঐ বুদ্ধিমান অথচ হৃদয়হীন মানুষটির উপর রাগ। কেন জানি আপনার উপরও রাগ হয়েছিল।

আমি তো তোমার রাগের যোগ্য নই, অরু। আমি অতি নগণ্য একজন, অতি তুচ্ছ।

হ্যাঁ, তুচ্ছ, তুচ্ছ তো বটেই।

অরু ভাতের থালা সরিয়ে উঠে পড়ল।

জহির বলল, কী হয়েছে ?

অরু বলল, বুঝতে পারছি না, সম্ভবত বমি আসছে।

সে ছুটে গেল বাথরুমে। চোখে মুখে পানি দিয়ে ফিরে এলো। হালকা গলায় বলল, জহির ভাই, আমাকে বাসায় পৌঁছে দিন।

কোন বাসায় ?

আমার স্বামীর বাসায়, আবার কোথায় ? অবশ্য আপনি যদি এখানে থেকে যেতে বলেন, তাহলে ভিন্ন কথা। বলবেন ? সাহস আছে ?

রিকশায় যেতে যেতে অরু বলল, আমার বায়োলজি খাতাটা আপনার বাসায় দেখলাম। খাতার লেখা কথাগুলি কি আপনি বিশ্বাস করেছেন ?

হ্যাঁ।

আপনি আসলেই বোকা। সব মিথ্যা। আজাহারকে কষ্ট দেয়ার জন্যে লিখেছিলাম।

জহির নিচু গলায় বলল, সব মিথ্যা ?

হ্যাঁ, সব। বাচ্চা নষ্ট করার যে গল্পটি করলাম, তাও মিথ্যা। জহির ভাই, আমি চমৎকার একজন অভিনেত্রী। এত চমৎকার যে, আমার কোনটা অভিনয় আর কোনটা অভিনয় নয়— তা আমি নিজেও জানি না।

তোমার বাচ্চা তাহলে নষ্ট হয় নি ?

না। জহির ভাই, আপনি দয়া করে আরেকটু সরে আসুন। আমি অচ্ছুৎ কেউ না। আমার গায়ে গা লাগলে পাপ যদি হয় আমার হবে, আপনার হবে না।

জহির বলল, তোমাকে দেখে আজাহার সাহেব খুব খুশি হবেন।

হ্যাঁ, হবেন। আচ্ছা জহির ভাই, একটা মজার কথা বলি ?

বলো।

মাঝে মাঝে আপনার বোকামিতে আমার গা জ্বলে যায়, আবার আপনার এই বোকামিটাকেই আমি ভালোবাসি। সেই সঙ্গে আপনাকেও।

অরু, চুপ কর তো।

অরু হাসতে হাসতে বলল, আরে বাবা, অভিনয় করছি। আপনি কি ভাবছেন এগুলো সত্যি কথা ? কোনো সুস্থ মাথার মেয়ে কি রিকশায় বসে প্রেমের সংলাপ বলতে পারে ? আপনি নিজেকে যতটা বোকা ভাবেন আসলে আপনি তার চেয়েও বোকা।

জহির চুপ করে রইল।

অরু গুনগুন করছে— 'জনম জনম কাঁদিব...।' এটা বোধহয় তার খুব প্রিয় গান।

একটা সূক্ষ্ম কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কেউ কিছু বলছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। সব বলতে হয় না। না বললেও অনেক কিছু বোঝা যায়। তা ছাড়া আসমানী বোকা মেয়ে নয়। সে বুঝতে পারছে কিছু একটা হয়েছে এবং তাকে নিয়েই হয়েছে। সেই কিছুটা কী? তাকে কেউ বলছে না। কখনো বলে না। সে-কি নিজেই কাউকে জিজ্ঞেস করবে? এতটা নির্লজ্জ কি সে হবে?

জহির নামের যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে, আজ থেকে মাত্র চারদিন পর যে বিয়ের অনুষ্ঠানটি হবে তাতে কি কোনো সমস্যা?

ওরা কি হঠাৎ ঠিক করল এরকম বিয়ে হওয়া মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়া যায় না? তারা কি অন্য একটি মেয়ের খোঁজ পেয়েছে যার আগে বিয়ে হয় নি? বিয়ে মানে কি ছিঁড়ে নেয়া ফুল? যে ফুল আর ব্যবহার করা যাবে না?

আসমানী রান্নাঘরে ঢুকল। তার মামি কড়াইয়ে কী যেন নাড়ছেন। সে কি কিছু জিজ্ঞেস করবে মামিকে? মামি একা থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত। তিনি একা নন। তিন চারজন মানুষ রান্নাঘরে। এদের মধ্যে অপরিচিত সুন্দরমতো একটি মেয়েও আছে। এর সামনে কিছু জিজ্ঞেস করার অর্থই হয় না।

আসমানীকে ঢুকতে দেখেই মামি বললেন, কিছু বলবি না-কি রে আসমানী?

আসমানী বলল, না।

যাচ্ছিস কোথায়?

কোথাও না।

আসমানী লক্ষ করল রান্নাঘরে উপস্থিত সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সমস্যাটা কী? তাকে বলে ফেললে কী হয়? তার মন এখন শক্ত হয়েছে। সে এখন আগের মতো না। অল্পতেই ভেঙে পড়ে না, পড়বেও না।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসমানী ভেতরের বারান্দায় খানিক্ষণ ইতস্তত হাঁটল। ভেতরের বারান্দায়ও বেশ কিছু মানুষ। বিয়ে উপলক্ষ্যে আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করেছেন।

ওরা সবাই এমন করে তাকাচ্ছেন কেন?

সুতিয়াখালির বড় ফুপুও দেখি এসেছেন। ইনাকে আসমানীর মোটেই পছন্দ না। সুতিয়াখালির ফুপু ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ভয়ঙ্কর সব ঝগড়া করেন ঝগড়ার পর কঠিন অভিশাপ দেন। লোকে বলে তাঁর অভিশাপ না-কি সঙ্গে সঙ্গে লেগে যায়।

বড় ফুপু বললেন, আসমানী, যাস কই?

একটু বাইরে যাচ্ছি বড় ফুপু।

তোর সাথে কথা আছে।

মামি রান্নাঘর থেকে এই কথা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে বললেন, না না, কোনো কথা নেই। আসমানী যেখানে যাচ্ছে যাক।

আসলে আসমানীর কোথাও যাবার জায়গা নেই। ঘর থেকে শুধু বের হওয়া। বের হয়েই বা সে কোথায় যাবে? সে শুনেছে পুরুষদের একা একা ঘুরতে ভালো লাগে। মেয়েদের লাগে না— অন্তত তার লাগে না। তার সব সময় ইচ্ছা করে পাশে কাউকে না কাউকে নিয়ে হাঁটতে। হাঁটার সময় ছোটখাট দু'একটা কথা হবে, গল্প হবে, হাসাহাসি হবে। তবেই না হেঁটে আনন্দ।

আসমানী একটা রিকশা নিল।

রিকশাওয়ালাটা বেশ মজার। কোথায় যাবে কিছু জিজ্ঞেস করে নি। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে চালাতে শুরু করেছে। যেন সে আসমানীর গন্তব্য জানে। আসমানীও কিছু বলল না। যাক না যেখানে যেতে চায়।

আচ্ছা ঐ লোকটির বাসায় হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হলে কেমন হয়? খুব কি অন্যায় হয়? না, কোনো অন্যায় হয় না। থাক, বাসা ভর্তি লোকজন থাকলে সে লজ্জা পাবে। আসমানী আবার ভাবল, লোকজন বোধহয় থাকবে না। ঐ লোকটি বড়ই একা।

জহির দরজা খুলে তাকিয়ে রইল।

আসমানী লাজুক গলায় বলল, আসব?

আসমানীর পরনে হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি। চুলগুলি বেণি করে বাঁধার কারণে তাকে বালিকা বালিকা দেখাচ্ছে।

জহির বলল, এসো।

কী করছিলেন?

রান্না করছিলাম।

আপনি কি নিজেই রান্না করেন?

মাঝে মাঝে করি। তবে বেশিরভাগ সময় বাইরেই খাই। ঘরে একটা কাজের লোক আছে, ও আবার রান্না জানে না।

বসব?

বসো। বসো। কেন বসবে না?

আপনাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে খুব কষ্টে আছেন। আপনার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি।

মনে হচ্ছে আপনার খুব শরীর খারাপ।

না, আমার শরীর খারাপ না।

ইস, ঘরটা আপনি এত বিশ্রী করে রেখেছেন। এত ক্যালেন্ডার কেন আপনার ঘরে? পুরনো ক্যালেন্ডারও দেখি আছে। ফেলতে মায়া লাগে, তাই না?

হ্যাঁ।

আমারও মায়া লাগে। আমিও সব পুরনো জিনিস জমা করে রাখি। আপনি আজ কী রান্না করছেন?

তেমন কিছু না। ভাত আর ডিম।

আসমানী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আপনার সম্পর্কে আমি খুব একটা অদ্ভুত কথা শুনেছি, আপনি নাকি সাত বছর বয়স থেকে মিথ্যা কথা বলেন না?

কার কাছ থেকে শুনেছ?

যার কাছে থেকেই শুনি না কেন, সত্যি না মিথ্যা সেটা বলুন।

ঠিকই শুনেছ। আমার এক বাংলার স্যার বলেছিলেন কেউ যদি চল্লিশ বছর মিথ্যা কথা না বলে থাকতে পারে, তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। তখন আমার বয়স ছিল কম। কমবয়সী বাচ্চারা তো পৃথিবীর সব কথাই বিশ্বাস করে। আমিও করেছিলাম। আমি তখন থেকেই মিথ্যা বলি না।

আসমানী বলল, মিথ্যা না বললে যে অদ্ভুত ব্যাপারটা হয়, সেটা কী?

অদ্ভুত ব্যাপারটা হচ্ছে তখন আল্লাহ ঐ লোকের একটি প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশ্নটি যত কঠিনই হোক, জবাব পাওয়া যায়।

আসমানী লজ্জিত গলায় বলল, ঐ দিন আমি আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। এটা ভেবে আমার এখন খুব খারাপ লাগছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি বাকি জীবনে কখনো আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। ঐ লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি সারাদিন উনার সঙ্গে ছিলাম।

জহির শান্ত গলায় বলল, আমি জানি।

আপনি জানেন?

হ্যাঁ, জানি। কেউ মিথ্যা বললে আমি ধরে ফেলতে পারি।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। সারাজীবন পরের বাড়িতে মানুষ হয়েছি। আমাকে সারাক্ষণ খেয়াল রাখতে হয়েছে কে আমার সম্পর্কে কী ভাবছে, কে আমাকে কীভাবে দেখছে। এইসব দেখতে দেখতে এক সময় টের পেলাম আমিও অনেক কিছু বুঝতে পারি। কেউ যখন সত্যি করে বলে, ভালোবাসি— সেটা যেমন বুঝি; আবার কেউ যখন মিথ্যা করে বলে, ভালোবাসি— সেটাও বুঝি। শুধু একজনেরটাই পারি না।

সেই একজনটা কে?

জহির চুপ করে রইল।

আসমানী বলল, আপনার মামাতো বোন অরু, তাই না?

হ্যাঁ।

দেখলেন তো, আমিও অনেক কিছু বুঝতে পারি।

তাই তো দেখছি।

আচ্ছা উনি কি বয়সে আমার বড়?

না মনে হয়।

উনি কি খুব কথা বলেন?

না। ও সবচেয়ে কম কথা বলত। এখন খুব কথা বলে। সারাক্ষণ কথা বলে।

কেন বলে জানেন?

না।

আমি জানি। উনি উনার স্বামীর কাছ থেকে বেশি কথা বলা শিখেছেন। নিশ্চয়ই উনার স্বামী খুব কথা বলেন। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর মতো হয়ে যায়।

জাহির হো-হো করে হেসে ফেলল।

আসমানী বলল, দেখলেন আমার কত বুদ্ধি? এখন আপনি দয়া করে একটু সরুন, আমি আমার নিজের জন্য এক কাপ চা বানাব।

মেয়েটা হাসছে। এত ভালো লাগছে দেখতে। জহির লক্ষ করল তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। তার বড়ই লজ্জা লাগছে। সে খুব চেষ্টা করতে লাগল চোখের পানি শুকিয়ে ফেলতে।

আসমানী বলল, জানেন, আপনার এখানে আমি খুব ভয়ে ভয়ে এসেছি!

কেন বলো তো?

আজ বাসায় কী জানি হয়েছে। মনে হয় বিরাট কোনো ঝামেলা। আমার বিয়েটা সম্ভবত ভেঙে গেছে।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, কী বলছ এসব?

সত্যি বলছি। আমি আগে আগেই অনেক কিছু বুঝতে পারি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিয়েটা ভেঙে গেল।

বিয়ের ঠিক তিনদিন আগে ফরসা লম্বা লাল টাই পরা একটা ছেলে প্রচণ্ড শব্দে আসমানীদের ঘরের কড়া নাড়তে লাগল। যেন সে অসম্ভব ব্যস্ত। যেন তার হাতে এক সেকেন্ডও সময় নেই।

দরজা খুলল আসমানী।

লাল টাই পরা মানুষটি হাসিমুখে বলল, আসমানী, বলো তো আমি কে?

আসমানী তাকিয়ে আছে। তার চোখ মাছের চোখের মতো হয়ে গেছে। সেই চোখে কোনো পলক নেই।

আমাকে চিনতে পারছ, না পারছ না?

পারছি।

আমি ভেতরে আসব, না আসব না?

আসুন।

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে আসব কী করে?

আসমানী দরজা ছেড়ে দিল।

মানুষটি হাসতে হাসতে বলল, আমি যে আসব তা তো সবাইকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি। কেউ তোমাকে কিছু বলে নি?

না।

খুবই আশ্চর্যের কথা। অবশ্যি না বলে একদিকে ভালোই করেছে। আমি নিজেই বলব। কিন্তু এখনো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না।

পারছি। পারব না কেন?

আমি জানি আমার উপর তোমার প্রচণ্ড রাগ। আমার একটা গল্প আছে, গল্পটা শুনলে রাগ থাকবে না।

আসমানী শান্ত গলায় বলল, আমার কিছুই শুনতে ইচ্ছে করছে না।

BDeBooks.com

ইচ্ছে না করলেও শুনতে হবে। এবং এখানে দাঁড়িয়ে এই গল্প আমি বলব না। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, Let's go.

আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

যেতে ইচ্ছে না করলেও তুমি যাবে। If I call you, you have to be there.

লোকটি অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আসমানীর হাত ধরল।

গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। আসমানীর ইচ্ছে করছে বলে, আস্তে চালান অ্যাকসিডেন্ট হবে। আবার বলতেও ইচ্ছে করছে না।

আসমানী ?

জি।

গল্পটা শুরু করি— আমাদের হেলথ ইন্সিওরেন্সের জন্য একটা মেডিক্যাল চেক-আপ হয়। সেই চেক-আপে আমার একটা ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ ধরা পড়ল। ডাক্তাররা আমার আয়ু বেঁধে দিলেন— তিন বছর। এইসব খবর তোমাকে দিলাম না। শুধু বিয়েটা ভেঙে দিলাম। আসমানী ?

জি।

তুমি মিরাক্যলে বিশ্বাস কর ? মিরাক্যল অর্থাৎ... বাংলা শব্দটা মনে পড়ছে না... অবিশ্বাস্য ধরনের কিছু বলতে পার।

বিশ্বাস করি।

আমি করতাম না। এখন করি। কারণ পৃথিবীর যে অল্প কিছু লোক ক্যান্সার জয় করেছে আমি তাদের একজন। আজ আমার শরীরে কোনো ক্যান্সার নেই। আজ আমি একজন সুস্থ মানুষ।

বলতে বলতে লোকটি বাঁ-হাত আসমানীর কোলের উপর রেখে আসমানীর দিকে তাকিয়ে হাসল। আসমানী বলল, আপনি দয়া করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালান। আপনি তো অ্যাকসিডেন্ট করবেন।

আসমানী ?

জি।

আমি জহির সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি তাঁর কাছে নতজানু হয়ে তোমাকে প্রার্থনা করেছি। মানুষটির হৃদয় দেখে আমি মুগ্ধ। তিনি কী বলেছেন, শুনতে চাও ?

ধরা গলায় আসমানী বলল, না, উনি কী বলবেন আমি জানি।

রাত প্রায় দশটা।

জহির রান্না বসিয়েছে।

তেলটা খারাপ। প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে। জহিরকে বার বার চোখ মুছতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে বুঝি খুব কাঁদছে। আসলেই তাই। ধোঁয়া ছাড়াই জহিরের চোখ বারবার ভিজে উঠছে।

অরুর শরীরটা খুব খারাপ। আজ তৃতীয় দিন। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত ব্লিডিং হচ্ছে। ছ' ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়েছে। আরো দিতে হবে। আজ সন্ধ্যায় ডাক্তাররা বলেছেন অবস্থা ভালো না।

জহির সারাদিন পাশে বসে ছিল। এক সময় অরু বলল, এত মন খারাপ করে আমার পাশে বসে থাকবেন না। আমার পাশে বসতে হলে হাসিমুখে বসতে হবে।

জহির বলল, আমি তোমার মতো কথায় কথায় হাসতে পারি না।

ইচ্ছা করেন না, তাই পারেন না। ইচ্ছা করলেই পারবেন।

জহির বলল, সত্যি করে বলো তো তোমার কি খারাপ লাগছে না ?

অরু ক্লান্ত গলায় বলল, নিজের জন্য লাগছে না, বাচ্চাটার জন্য লাগছে। এত সুন্দর পৃথিবীর কিছুই সে দেখবে না ? না দেখেই মরে যাবে ?

চুপ করে শুয়ে থাক অরু। বেশি কথা বলা বারণ।

জহির ভাই, আসমানী কি তার স্বামীর সঙ্গে চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?

হ্যাঁ।

কিছু বলেছিল ?

না।

অরু বলল, আপনি খুব ভাগ্যবান মানুষ জহির ভাই।

কেন বলো তো ?

এই মেয়েটি জনম জনম আপনার জন্য কাঁদবে। এত বড় সৌভাগ্য ক'জন পুরুষের হয় বলুন ?

বড্ড ধোঁয়া হচ্ছে। জহির রান্নাঘর থেকে বারান্দায় চলে এলো। অবাক হয়ে দেখল বারান্দায় রেলিং ধরে আজাহার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে।

জহিরকে দেখেই বললেন, অরুর খুব শখ ছিল তার মেয়ের নাম রাখবে রাত্রি— কেন জানেন ? কারণ রাত্রি কখনো সূর্যকে পায় না। অবশ্য তাতে তার কোনো ক্ষতি নেই, কেননা তার আছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।

আজাহার সাহেব চাদরে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ভাই, আপনাকে একটা খারাপ খবর দিতে এসেছি। আপনি দয়া করে আকাশের দিকে তাকান। মনটাকে শক্ত করুন।

—

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com